গোপন করেছে। তদুপরি এ ঔদ্ধত্য অবলম্বন করেছে যে, তাতে আনন্দ প্রকাশ করেছে এবং নিজেদের এহেন গর্হিত কাজকে প্রশংসার যোগ্য সাব্যস্ত করেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ অবস্থাটি উল্লেখযোগ্য,) যখন আল্লাহ্ তা'আলা (পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে) আহলে-কিতাবদের কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা (প্রতিশ্রুতি) নিয়েছেন (অর্থাৎ তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন এবং তারা তা মেনে নেয়) যে, এই কিতাবের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের সামনে বিবৃত করবে এবং (কোন বিষয় পার্থিব স্বার্থের জন্য) গোপন রাখবে না। বস্তুত তারা সে আদেশকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছে (অর্থাৎ তাতে আমল করে নি)। পক্ষান্তরে তার বদলায় স্বল্পমূল্য বিনিময় নিয়ে নিয়েছে। সুতরাং তারা যা আহরণ করেছে তা একান্তই মন্দ বস্তু। কারণ, তার পরিণতি হল দোযখের শাস্তি।

(তোমরা শোন,) যারা নিজেদের কৃত (অপ-) কর্মের জন্য আনন্দিত হয় এবং যে সৎকর্ম তারা করেনি তার জন্য প্রশংসা পেতে চায়, এমন লোকদের (সম্পর্কে) কস্মিন-কালেও ধারণা করবে না যে, তারা (দুনিয়ায়) বিশেষ ধরনের আযাব থেকে নিরাপদে থাকতে পারবে। (তা কখনই হবার নয়। এ পৃথিবীতেও তাদের কিছু শাস্তি হবে) এবং (আখিরাতেও) তাদের বেদনাদায়ক শাস্তি হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই (নির্ধারিত) আসমান ও যমীনের বাদশাহী। আর যাবতীয় বস্তুর উপর আল্লাহ্ই ক্ষমতাশালী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধর্মীয় জ্ঞান গোপন করা হারাম এবং কোন কাজ না করেই তার জন্য প্রশংসার অপেক্ষা করা দূষণীয়ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আহ্লে-কিতাবদের দু'টি অপরাধ এবং তার শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর তা হল এই যে, তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল কিতাবের বিধি-বিধানসমূহকে কোন রকম হেরফের বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করে জনসমক্ষে বিবৃত করে দেবে এবং কোন নির্দেশই গোপন করবে না। কিন্তু তারা নিজেদের পার্থিব স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে সে প্রতিজ্ঞার কোন পরোয়াই করেনি; বহু বিধি-নিষেধ তারা গোপন করেছে।

দ্বিতীয়ত তারা সৎকর্ম তো করেই না, তদুপরি কামনা করে যে, সৎ কাজ না করা সত্ত্বেও তাদের প্রশংসা করা হোক।

তওরাতের বিধি-বিধান গোপন করার ঘটনা সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইহুদীদের কাছে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করলেন যে, এটা কি তওরাতে আছে? তারা তা গোপন করল এবং যা তওরাতে ছিল, তার বিপরীত বলে দিল। আর তাদের এ অসৎ-কর্মের জন্য আনন্দিত হয়ে ফিরে এল যে, আমরা চমৎকার ধোঁকা দিয়ে দিয়েছি। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হল, যাতে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় ব্যাপার, না-করা কাজের জন্য প্রশংসার আগ্রহী হওয়া। তা হল মুনাফিক ইহুদীদের একটি কর্মপন্থা যে, কোন জিহাদ সমাগত হলে তারা কোন ছলছুতার ভিত্তিতে ঘরে বসে থাকত এবং এভাবে জিহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য আনন্দ উদ্‌যাপন করত। আর রসূলে করীম (সা) যখন ফিরে আসতেন, তখন তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে মিথ্যা কসম খেয়ে নানা অজুহাত বর্ণনা করত এবং আশা করত যে, তাদের এহেন কাজের জন্য প্রশংসা করা হোক। ---(বুখারী)

কোরআনে করীমে এতদুভয় বিষয়ে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। তাতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ধর্মীয় জ্ঞান ও আল্লাহ্‌র রসূলের বিধি-বিধান গোপন করা হারাম। তবে এ গোপন করা ব্যাপারটি হল তেমনিভাবে গোপন করা যা ইহুদীদের কাজ ছিল। অর্থাৎ পার্থিব স্বার্থে আল্লাহ্‌র আহ্‌কাম গোপন করা। তারা তা করে মানুষের কাছ থেকে অর্থ-কড়ি গ্রহণ করত। অবশ্য কোন ধর্মীয় কল্যাণ বিবেচনায় যদি কোন বিশেষ হুকুম জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ করা না হয়, তবে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন ইমাম শাফিয়ী (র) স্বতন্ত্র এক পরিচ্ছেদে এ ব্যাপারে হাদীসের উদ্ধৃতি সহকারে বিবৃত করেছেন যে, অনেক সময় কোন কোন হুকুম প্রকাশ করতে গেলে সাধারণ জনগণের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে এবং এতে তাদের নানা ফিতনা-ফাসাদে পতিত হয়ে পড়ারও আশংকা দেখা দিতে পারে। এমন আশংকায় কোন হুকুম গোপন করা হলে তাতে কোন দোষ নেই।

কোন সৎ কাজ করে সে জন্য প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনের অপেক্ষা করা হলে সৎ কাজ করা সত্ত্বেও শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তা দূষণীয় এবং কাজ না করা সত্ত্বেও এরূপ আচরণ তো আরও বেশী দূষণীয়। আর মনের দিক দিয়ে এমন বাসনা সৃষ্টি হওয়া যে, আমিও অমুক কাজটি করব এবং তাতে সুনাম হবে, তাহলে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য যদি সুনামের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবস্থা করা না হয়। ---(বয়ানুল-কোরআন)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ
تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا
سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ اٰمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۚ رَبَّنَا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَ

اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

(১৯০) নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। (১৯১) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে (তারা বলে), পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদের তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (১৯২) হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করলে তাকে চরমভাবে অপমানিত করলে; আর জালিমদের জন্য তো কোন সাহায্যকারী নেই। (১৯৩) হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্‌বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্‌বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। (১৯৪) হে আমাদের পালন কর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রসূলদের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদের তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না।

যোগসূত্র ঃ আগের আয়াতগুলোতে যেহেতু বিশেষভাবে তওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তাই পরবর্তী এ আয়াতগুলোতে তওহীদের দলীল-প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। সাথে সাথে তওহীদের শিক্ষানুযায়ী আমলকারীদের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে পরোক্ষ-ভাবে অন্যদেরকেও এদিকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এরও আগে ছিল কাফিরদের তরফ থেকে নির্যাতনের প্রসঙ্গ, তাই এর পরে পুনরায় সে প্রসঙ্গেরই অবতারণা রয়েছে। যেমন, মুশরিকরা হুযূর (সা)-কে বিপাকে ফেলার বদ মতলবে বলেছিল যে, এই সাফা পাহাড়টিকে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। সে প্রসঙ্গেই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করার মত দলীল-প্রমাণ তো চোখের সামনেই অনেক রয়েছে, সেগুলো নিয়ে এরা চিন্তা-ভাবনা করে না কেন? অধিকন্তু, কাফিরদের এ ধারণা যেহেতু সত্য উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে নয়, নিছক বিব্রত করার উদ্দেশ্যে উত্থাপিত হয়েছিল, কাজেই সেমতে সে আবদার পূর্ণ হওয়ার পরও তারা ঈমান আনতো না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিঃসন্দেহে আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং একের পর এক দিন ও রাত্রির আবর্তনে তওহীদের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ মওজুদ রয়েছে। যারা সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী তাদের পক্ষে প্রমাণ আহরণের জন্য (এগুলোই) যথেষ্ট। (সুস্থ বুদ্ধির প্রমাণই হচ্ছে প্রকৃত কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা এবং অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকার মত বোধশক্তির অধিকারী হওয়া। পরবর্তী আয়াতই সে বুদ্ধিবৃত্তির প্রমাণ। যেমন,) সে সমস্ত লোক (সর্বাবস্থায়,

অন্তরে এবং মৌখিক স্বীকৃতিতেও) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে---সব অবস্থাতেই। আর আসমান যমীন সৃষ্টির বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে (বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে) এবং (চিন্তার যে ফল অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি, বিশ্বাসে দৃঢ়তা এবং নবায়ন, সে ফল তারা এভাবে প্রকাশ করে---) হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এই বিশাল জগৎ অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। (বরং এতে বিস্তর রহস্য রয়েছে। তন্মধ্যে একটি রহস্য হচ্ছে এ বিরাট সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে এর সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ লাভ করা যাবে)। আমরা আপনাকে (অর্থহীন কিছু সৃষ্টি করবেন, এমনটি থেকে) পবিত্র মনে করি। (তাই আমরা প্রমাণ গ্রহণ করেছি এবং তওহীদ স্বীকার করে নিয়েছি) তাই আমাদের (যেহেতু আমরা মু'মিন ও তওহীদবাদী, সেহেতু) দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (যদিও শরীয়তের নিরিখে তওহীদে ঈমান আনার ক্ষেত্রে কোন কারণ বা দুর্বলতার জন্য আযাবের উপযোগীও আমরা হতে পারি, আযাবে নিক্ষিপ্তও হতে পারি। আমরা আরো আরজী পেশ করছি যে,) হে আমাদের পালনকর্তা, (আমরা এজন্য দোযখের আযাব থেকে আশ্রয় ভিক্ষা চাই) নিশ্চয় আপনি যাকে (তার কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে) দোযখে নিক্ষেপ করবেন, তাকে সত্যিকার অর্থেই লাঞ্ছিত করবেন (এটা কাফিরদের পরিণাম)। আর এসব অত্যাচারী লোক (যাদের পরিণতি হবে দোযখের শাস্তি) তাদের সাহায্যকারী কেউ থাকবে না। (অপরদিকে ঈমানদারদের সম্পর্কে আপনার অঙ্গীকার হচ্ছে যে, আপনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন না, পরন্তু তাদের সাহায্য করবেন। তাই আমাদের নিবেদন, কুফরীর প্রকৃত শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন। ঈমানের প্রকৃত পরিণতি দোযখের আযাব থেকে অব্যাহতি লাভকে আমাদের ভাগ্যলিপি করে দিন)।

হে আমাদের পালনকর্তা, (যেমন আপনার এ বিশাল সৃষ্টি দেখে আমরা স্বাভাবিক-ভাবেই আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ লাভ করেছি, তেমনি) একজন আহ্‌বানকারীর আহ্‌বান শুনেছি (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ [সা]-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যক্ষভাবে তাঁর যবানী অথবা অন্যের মাধ্যমে তিনি) ঈমান আনার জন্য আহ্‌বান জানাচ্ছেন (যে হে লোক সকল!) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন। সেমতে আমরা (তাঁর আহ্‌বানে সাড়া দিয়ে) ঈমান এনেছি (এ আরজীতে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের সাথে সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে রসূলের প্রতি ঈমানের কথাও এসে গেল। ফলে ঈমানের দুটি অংশই পূর্ণ হয়ে গেল)।

হে আমাদের পালনকর্তা! (পুনরায় আমাদের এ আরজী যে) আমাদের (বড়) গোনাহগুলোও মাফ করে দিন এবং আমাদের (ছোট ছোট) ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোও আমাদের থেকে অপসারিত করে (মাফ করে) দিন এবং (আমাদের শেষ পরিণতি যার উপর সবকিছু নির্ভরশীল) আমাদেরকে নেক লোকদের সাথে (শামিল রেখে) মৃত্যু দিন। (অর্থাৎ নেকীর মধ্যে যেন আমাদের জীবন শেষ হয়)।

হে আমাদের পালনকর্তা! (যেভাবে আমরা দোযখ, বড় বড় গোনাহ এবং ছোট ছোট ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রভৃতি ক্ষতিকর দিক থেকে আত্মরক্ষার আবেদন পেশ করছি, তেমনি প্রকৃত কল্যাণের জন্যও আরজী পেশ করছি---) আমাদের সেই সব বস্তুও দান করুন (যেমন, সওয়াব ও জান্নাত) যে সম্পর্কে আপনি আপনার রসূলদের মাধ্যমে ওয়াদা করেছেন (যে মু'মিন নেক বান্দাদের মহত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে) এবং (সে সওয়াব ও

জান্নাত আমাদের এমনভাবে দান করুন, যেন তা পাওয়ার আগেও) আমাদের কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত করবেন না। (যেরূপ এক শ্রেণীর লোককে প্রথমে সাজা দিয়ে পরে জান্নাতে দাখিল করা হবে। অর্থাৎ কোনরূপ সাজা ছাড়া প্রথমবারই আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)। নিশ্চিতরূপেই আপনি ওয়াদা খেলাফ করেন না। (কিন্তু আমাদের ভয় হয়, যে মু'মিন ও নেক বান্দাদের জন্য এ ওয়াদা করেছেন, তাতে এমন যেন না হয় যে, আমরা সেই সব লোকের গুণে গুণান্বিত হতে না পারি। সে জন্যই আমাদের আরজী যে, আমাদের এমনভাবে গড়ে তুলুন, যেন আমরা ওয়াদাকৃত সেই সব নিয়ামত লাভ করার উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের শানে নযুল ঃ এ আয়াতের শানে নযুল সম্পর্কে ইবনে-হাব্বান তাঁর সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে এবং মুহাদ্দিস ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবী আ'তা ইবনে আবী রুবাহ হযরত আয়েশা (রা)-র নিকট হাযির হয়ে নিবেদন করলেন, হুযূর (সা)-এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক যে বিষয়টি আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন, সেটি আমাকে বলে দিন। এরই উত্তরে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তাঁর কোন্ বিষয়টির কথা জিজ্ঞেস করছ? তাঁর জীবনের প্রতিটি বিষয়ই তো ছিল আশ্চর্যজনক। তাঁর থেকে একটা আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা বলছি। সেটি ছিল এমন ঃ হুযূর (সা) এক রাতে আমার কাছে এলেন এবং লেপের নিচে আমার সাথে শুলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন যদি অনুমতি দাও, তবে আমি কিছুক্ষণ আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আসি। একথা বলে বিছানা ছেড়ে উঠলেন এবং ওযূ করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযে এমনভাবে রোনাজারী করলেন যে, তাঁর সিনা মুবারক পর্যন্ত অশ্রুতে ভিজে গেল। অতঃপর রুকূতে গিয়েও কাঁদলেন। তারপর সিজদায় গেলেন এবং সিজদাতেও তেমনিভাবে কাঁদলেন। অতঃপর মাথা উঠিয়েও ক্রমাগত কাঁদতেই থাকলেন ; এমনিভাবে ভোর হয়ে গেল। হযরত বিলাল (রা) এসে নামাযের জন্য ডাকলেন। অবস্থা দেখে হযরত বিলাল (রা) আরজ করলেন, হুযূর (সা), আপনি এমনভাবে কেন কাঁদেন, আল্লাহ্ পাক তো আপনার সামনের ও পিছনের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন ?

হুযূর (সা) জবাব দিলেন, আমি কি আল্লাহ্র শোকর-গোযার বান্দা হবো না ? তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় অশ্রু প্রবাহিত করবো না ? আল্লাহ্ তা'আলা যে আজকের রাতে আমার প্রতি এই আয়াত নাযিল করেছেন ! এই বলে উপরোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। এরপর বললেন---"অত্যন্ত দুর্ভাগা সেই লোক, যে আয়াতগুলো পড়ার পরও এ সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে না।"

এ আয়াতগুলোতে চিন্তা-ভাবনার প্রসঙ্গেই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে ভাবতেহয়।

(এক) 'আসমান-যমীন সৃষ্টি' বলতে কি বোঝায় ঃ خلق শব্দের অর্থে নতুন আবিষ্কার ও সৃষ্টি। অর্থ হচ্ছে,---আসমান এবং যমীন সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান। এ দুয়ের মধ্যে অবস্থিত আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য সৃষ্টিকেও

এ আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এ বিরাট সৃষ্ট জগতের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই স্ব স্ব সৃষ্টিকর্তার নিদর্শন রূপে দাঁড়িয়ে আছে।

আরো একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে السموٰت শব্দ দ্বারা যেমন উর্ধ্বজগত তথা সকল উন্নতি বোঝায়, তেমনি أرض বলতে নিম্নজগত তথা নিম্নমুখী সব কিছুকেই বোঝায়। সেমতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ পাক যেমন সকল উচ্চতা ও উন্নতির সৃষ্টিকর্তা, তেমনি নিম্নজগত তথা সকল নিম্নমুখিতারও সৃষ্টিকর্তা।

(দুই) দিন-রাত্রির আবর্তন ঃ চিন্তা-ভাবনার দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, দিন-রাত্রির আবর্তন অর্থে কি বোঝানো হয়েছে! এখানে اختلاف শব্দটি আরবী পরিভাষায় اختلف فلان فلانًا (অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির পরে এসেছে,) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সেমতে اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ বাক্যের অর্থ হবে, রাত্রির গমন এবং দিবসের আগমন।[১]

اختلاف শব্দ দ্বারা কম-বেশীও বোঝায়। যেমন, শীতকালে রাত দীর্ঘ হয় এবং দিন হ্রস্ব হয়, গরমকালে দিন বড় হয় এবং রাত ছোট হয়। অনুরূপ এক দেশ থেকে অন্য দেশে দিন ও রাতের মধ্যে দৈর্ঘ্যের তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন, উত্তর মেরুর সন্নিকটবর্তী দেশগুলোর দিবাভাগ উত্তর মেরু থেকে দূরবর্তী দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশী দীর্ঘ হয়। এ সব বিষয়ই আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতের একেকটি অতি উজ্জ্বল নিদর্শন।

(তিন) 'আয়াত' শব্দের অর্থ ঃ তৃতীয় ভাবনার বিষয় হচ্ছে 'আয়াত' বা নিদর্শন বলতে কি বোঝায়? آيات - آية-এর বহুবচন। শব্দটি কয়েকটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যথা, মু'জিযাকে যেমন 'আয়াত' বলা হয়, তেমনি কোরআন শরীফের বাক্যকেও 'আয়াত' বলা হয়। তৃতীয় অর্থে দলিল-প্রমাণও বোঝানো হয়ে থাকে। এখানে তৃতীয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এসব বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে।

(চার) أولوا الالباب—চতুর্থ বিবেচ্য বিষয়। أولوا الالباب শব্দের অর্থ সম্পর্কে ভাবনার বিষয় হচ্ছে, এর দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে?

الباب শব্দটি لب শব্দের বহুবচন। অর্থ মগজ। প্রত্যেক বস্তুরই মগজ অর্থে তার সারবস্তুকে বোঝায় এবং সে সারটুকু দ্বারা সংশ্লিষ্ট বস্তুর বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়। এ কারণেই মানুষের বুদ্ধি ও মেধাকে لب বলা হয়। কেননা, বুদ্ধিই মানুষের প্রধান সারবস্তু। সেমতে أولوا الالباب শব্দের অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিমান লোকজন।

বুদ্ধিমান শুধুমাত্র তারাই যারা ঈমান গ্রহণ করে এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে ঃ এ বিষয়টি ছিল লক্ষণীয় যে, বুদ্ধিমান বলতে কাদেরকে বোঝায়? কারণ, সমগ্র বিশ্বে

প্রতিটি মানুষই বুদ্ধিমান হওয়ার দাবীদার। কোন একজন একান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও নিজেকে নির্বোধ বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। সেজন্যই কোরআনে-করীম বুদ্ধিমানের এমন কয়েকটি লক্ষণ বাতলে দিয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষেই বুদ্ধির মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হতে পারে।

প্রথম লক্ষণটি হলো আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অনুভূত বিষয়ের জ্ঞান কান, নাক, চোখ, জিহ্‌বা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও লাভ করা যায়। নির্বোধ জীব-জন্তুর মধ্যেও তা রয়েছে। পক্ষান্তরে বুদ্ধির কাজ হলো, লক্ষণীয় নিদর্শনাদির মধ্য থেকে গৃহীত দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে এমন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যা অনুভবযোগ্য নয় এবং যার দ্বারা বাস্তবতার সর্বশেষ উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।

এই মূলনীতির প্রেক্ষিতে সৃষ্ট জগতের প্রতি লক্ষ্য করলে আসমান, যমীন এবং এর অন্তর্গত যাবতীয় সৃষ্টি ও সেগুলোর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সামগ্রীর সুদৃঢ় ও বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা বুদ্ধিকে এমন এক সত্তার সন্ধান দেয়, যা জ্ঞান-অভিজ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত এবং যিনি যাবতীয় বস্তু-সামগ্রীকে বিশেষ হিকমতের দ্বারা তৈরী করেছেন। তাঁরই ইচ্ছায় এই সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুত সে সত্তা একমাত্র আল্লাহ্‌ জাল্লা-শানুহুরই হতে পারে। কোন এক আরেফ বলেনঃ

ھر گیاھے کے از زمیں روید
وحدہٗ لا شریک لہٗ گوید۔

মানুষের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ব্যর্থতা সর্বদা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কাজেই তাকে এই ব্যবস্থার পরিচালক বলা চলে না। সেজন্যই আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তাতে উৎপন্ন বস্তুনিচয়ের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুদ্ধির সামনে একটি মাত্র পরিণতি সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর তা হল আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ, তাঁর আনুগত্য এবং তাঁরই যিকর করা। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে, সে বুদ্ধিমান বলে কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কাজেই কোরআন-মজীদ বুদ্ধিমানদের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ অর্থাৎ বুদ্ধিমান হলো সে সমস্ত লোক, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে স্মরণ করে বসে, শুয়ে, ডানে ও বামে। অর্থাৎ সর্বাবস্থায়, সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌ তা'আলার স্মরণে নিয়োজিত থাকে।

এতে বোঝা গেল যে, বর্তমান পৃথিবী যে বিষয়টিকে বুদ্ধি এবং বুদ্ধিমানের মাপকাঠি বলে গণ্য করে নিয়েছে, তা শুধুমাত্র একটা ধোঁকা। কেউ ধন-সম্পদ গুটিয়ে নেওয়াকে বুদ্ধিমত্তা সাব্যস্ত করেছে, কেউ বিভিন্ন ধরনের কল-কব্জা তৈরী করা কিংবা বাষ্প-বিদ্যুৎকে প্রকৃত শক্তি মনে করার নামই রেখেছে বুদ্ধিমত্তা। কিন্তু সুস্থ বিবেক ও সুষ্ঠু বুদ্ধির কথা হলো তাই, যা আল্লাহ্‌ তা'আলার নবী-রসূলগণ নিয়ে এসেছেন। যাতে করে ইলম ও হিকমতের আলোকে পার্থিব ব্যবস্থা পরম্পরা নিম্ন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে গিয়ে মধ্যবর্তী পর্যায়গুলোকে উপেক্ষা করেছে। বিজ্ঞান তোমাদের কাঁচামাল থেকে কল-কারখানা পর্যন্ত এবং কল-কারখানা থেকে বাষ্প-বিদ্যুতের শক্তি পর্যন্ত

পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু বুদ্ধির কাজ হলো আরও একটু এগিয়ে দেওয়া যাতে তোমরা বুঝতে পার, উপলব্ধি করতে পার যে, আসল কাজটি কি মাটি, পানি বা লোহা-তামার, না মেশিনের ; অথবা সেগুলোর মাধ্যমে তৈরী বাষ্পের। বরং কাজটি তাঁরই যিনি আগুন, পানি ও বায়ুকে সৃষ্টি করেছেন--যার ফলে এই বিদ্যুৎ, এই বাষ্প তোমরা পেতে পারছ।

বিষয়টি সাধারণ উদাহরণের মাধ্যমে এভাবে বোঝা যায় যে, বনে বসবাসকারী কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যখন কোন রেল স্টেশনে গিয়ে হাযির হয় এবং দেখতে পায়, রেলের মত একটা মহাকায় যান একটা লাল পতাকা দেখানোর ফলে থেমে পড়ে আর একটা সবুজ পতাকা দেখাতেই চলতে শুরু করে। এটা দেখার পর যদি সে বলে যে, এই লাল ও সবুজ পতাকা দুটি বিরাট শক্তির অধিকারী---এহেন বিরাট শক্তিশালী ইঞ্জিনকেও সে থামিয়ে দেয় এবং চালায়। তখন যে কোন বুদ্ধিমান জ্ঞানীই তাকে বোকা বলবেন এবং বাতলে দেবেন যে, ক্ষমতা এই পতাকার নয়, বরং সেই লোকটির হাতেই রয়েছে যে ইঞ্জিনের গোড়ায় বসে আছে। সে-ই এ পতাকা দেখে গাড়ী থামানো কিংবা চালানোর কাজটি সম্পন্ন করে। কিন্তু যার মাথায় এর চেয়েও কিছু বেশী বুদ্ধি রয়েছে সে বলবে, ইঞ্জিনের ড্রাইভারকে ক্ষমতার অধিকারী বলাও ভুল। কারণ, এতে তার ক্ষমতার কোনই হাত নেই। সে লোক আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সেই ক্ষমতাকে ইঞ্জিনের কলকব্জার সাথে সম্পৃক্ত করবে। কিন্তু একজন দার্শনিক কিংবা একজন বৈজ্ঞানিক তাকে এই বলে নির্বোধ প্রতিপন্ন করবেন যে, নিস্পন্দ কলকব্জার ভেতরে কি থাকবে। আসল ক্ষমতা হলো সেই বাষ্প ও ষ্টীমের মধ্যে যে আগুন ও পানি আছে তার যার সংমিশ্রণে ইঞ্জিনের মধ্যে শক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শন এখানে এসেই স্তব্ধ হয়ে পড়ে। নবী-রসূলগণ বলেন আরে বোকা ! পতাকা, ড্রাইভার কিংবা ইঞ্জিনের কলকব্জাগুলোকে ক্ষমতা ও পাওয়ারের অধিকারী মনে করা যেমন ভুল বা মূর্খতা তেমনি বাষ্প এবং ষ্টীমকে ক্ষমতার অধিকারী বলে ধারণা করাও দার্শনিক ভ্রান্তি। এক ধাপ আরো এগিয়ে যাও। তাহলেই তুমি জট পাকানো এই সুতোর মাথা পেয়ে যাবে এবং তাতে বিশ্বব্যবস্থার সর্বশেষ বলয় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুতে পারবে যে, প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী তিনিই, যিনি এ আগুন আর পানিকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তৈরী হয়েছে এই ষ্টীম।

এ ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, সেই সব লোকই শুধু বুদ্ধিমান বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য, যারা আল্লাহ্‌কে চিনবেন এবং সর্বাবস্থায়, সর্বক্ষণ তাঁকে স্মরণ করবেন। সে জন্যই أُولِي الْأَلْبَابِ বা বুদ্ধিমান)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআন বলেছে ঃ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

আর সে কারণেই, যদি কেউ মৃত্যুকালে ওসীয়ত করে যায় যে, আমার ধন-সম্পদ বুদ্ধিমানদের দিয়ে দেবে, তবে তা কাকে দেওয়া হবে,---এ প্রশ্নের উত্তরে ইসলামী ফিকহ্ শাস্ত্রবিদরা লিখেছেন যে, এমন আলিম ও জাহিদ ব্যক্তিরাই সে মালের অধিকারী হবেন,

যাঁরা পার্থিব সম্পদাহরণ এবং অপ্রয়োজনীয় জড় বিষয় থেকে দূরে থাকেন। তার কারণ, প্রকৃত অর্থে তাঁরাই হচ্ছেন বুদ্ধিমান।— (দুররে মুখতার ঃ ওসীয়ত পরিচ্ছেদ)

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষ্য করার যোগ্য যে, শরীয়তে 'যিক্‌র' ছাড়া অন্য কোন ইবাদতের আধিক্যের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। কিন্তু 'যিকর-'এর ব্যাপারে বলা হয়েছে— وَاذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যিক্‌র কর অধিক পরিমাণে)। তার কারণ এই যে, যিকর ব্যতীত অন্য সব ইবাদতের জন্যই কিছু নিয়ম-পদ্ধতি ও শর্ত রয়েছে যার অবর্তমানে সে ইবাদত আদায় হয় না। পক্ষান্তরে মানুষ দাঁড়িয়ে, শুয়ে, বসে, ওযূর সাথে, ওযূ ছাড়া যে কোন অবস্থায় যিক্‌র-এর কাজ সম্পাদন করতে পারে। এ আয়াতেও হয়তো এই তাৎপর্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে বুদ্ধিমানদের অপর একটি লক্ষণ বলা হয়েছে যে, তারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন। বলা হয়েছে ঃ يَتَفَكَّرُونَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ— (অর্থাৎ তারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে)।

এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, এই চিন্তা করার তাৎপর্য কি এবং তার কারণই বা কি?

تَفَكُّر ও فِكْر...(ফিক্‌র ও তাফাক্কুর)-এর শাব্দিক অর্থ হলো বিবেচনা করা, কোন বিষয়ের তাৎপর্য ও বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছুতে চেষ্টা করা। এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার 'যিক্‌র' যেমন ইবাদত, তেমনিভাবে 'যিকর' বা চিন্তা করাও ইবাদত। পার্থক্য শুধু এই যে, যিক্‌র হলো আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সাপেক্ষ। আর ফিক্‌র-এর উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার অন্বেষণ। তার কারণ, আল্লাহ্‌র সত্তা ও তাঁর গুণাবলীর তাৎপর্য অনুভব করা মানব বুদ্ধির বহু ঊর্ধ্বে। এতে চিন্তা-গবেষণা করার ফল হতভম্বতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আরেফ রূমী বলেছেন ঃ

دور بینان بارگاہ الست
غیر ازیں پے نبردہ اند کہ ہست

বরং অনেক সময় আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অধিকতর চিন্তা-ভাবনা করতে গেলে মানুষের অসম্পূর্ণ বুদ্ধির জন্য তা গোমরাহীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই মা'রেফাতের বুযুর্গ মনীষীবৃন্দ ওসীয়ত করেছেন ঃ تفکروا فی ایت اللہ ولا تفکروا فی اللہ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ সম্পর্কে চিন্তা কর, আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করো না। তা তোমাদের জ্ঞান-পরিধির ঊর্ধ্বে। সূর্যের

আলোতে সব কিছুই দেখা যায়, কিন্তু স্বয়ং সূর্যকে কেউ দেখতে চাইলে তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সে কারণেই বড় বড় বিজ্ঞ দার্শনিক ও বিচক্ষণ মহাজনগণ শেষ পর্যন্ত এ উপদেশবাণীই উচ্চারণ করেছেন ঃ

نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن
کہ جاھا سپر باید انداختن

অবশ্য চিন্তা-ভাবনা এবং বুদ্ধির বিচরণক্ষেত্র হলো আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ। সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করার অপরিহার্য ফলই হলো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মা'রেফাত বা পরিচয় লাভ। এই বিশাল-বিস্তৃত আকাশ আর তাতে স্থাপিত চন্দ্র-সূর্য এবং অন্যান্য স্থির ও চলমান গ্রহ-নক্ষত্ররাজি যা দেখে দর্শকের নিকট যদিও সব-গুলোকেই স্থির বলে মনে হয়, তাতে অতি ক্ষীণ কোন স্পন্দন হলে তার জ্ঞান সেই স্পন্দন সৃষ্টিকারীরই হয়ে থাকে। তেমনিভাবে উল্লিখিত গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে যেগুলো চলমান ও গতিশীল সেগুলোর গতি যেহেতু চন্দ্র-সূর্যের গতির সাথে অত্যন্ত সুদৃঢ় নিয়মে বাঁধা; না এতে এক মুহূর্তও এদিক-ওদিক হয়, না তার যন্ত্রপাতির কোন কল-কব্জা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, না ভেঙে-চুরে যায় আর না সেগুলোকে কখনও কোন ওয়ার্কশপে পাঠা-নোর প্রয়োজন হয়, না তার মেশিনারীতে কোন তেল-পানির প্রয়োজন দেখা দেয়।---হাজার হাজার বছর ধরে সেগুলোর প্রদক্ষিণ-পরিক্রমণ একই নিয়মে নির্ধারিত সময়ের সাথে চলছে। তেমনিভাবে গোটা ভূমণ্ডলীয় উপগ্রহ, তার সাগর-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত এবং এতদুভয়ের মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টি---গাছ-পালা, জীব-জন্তু আর তার ভেতরে লুক্কায়িত খনিসমূহ এবং আসমান-যমীনের মাঝে প্রবাহিত বায়ু, এ দুয়ের মাঝে সৃষ্ট ও বর্ষণমুখর বিদ্যুৎবারি ও তার নির্ধারিত ব্যবস্থাদি সবই চিন্তা-ভাবনাকারীদের জন্য এমন সত্তার সন্ধান দেয়, যিনি ইলম ও হিকমত এবং শক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থিত। এরই নাম হলো 'মা'রেফাত'। কাজেই এই মা'রেফাতে-ইলাহী তথা আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় লাভের কারণ হয় বলেই চিন্তা-ভাবনাও বিরাট ইবাদত। সেজন্যই হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন ঃ تفكر ساعة خير من قيام ليلة অর্থাৎ এক প্রহরের চিন্তা-ভাবনা গোটা রাত্রির ইবাদত অপেক্ষা উত্তম এবং অধিক উপকারী। ---(ইবনে-কাসীর)

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-ও এই চিন্তা-ভাবনাকে সর্বোত্তম ইবাদত বলে উল্লেখ করেছেন। ---(ইবনে-কাসীর)

হযরত হাসান ইবনে আমের (র) বলেছেন, আমি বহু সাহাবীর কাছে শুনেছি তাঁদের সবাই বলেছেন যে, "ঈমানের আলো ও নূর হলো চিন্তা-ভাবনা।"

হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেছেন যে, আমি যখন ঘর থেকে বেরোই তখন যে বস্তুর উপরেই আমার দৃষ্টি পড়ে আমি তাকে গভীরভাবে দেখি। হয়ত আমার জন্য তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট নিয়ামত বিদ্যমান রয়েছে কিংবা আমার শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ বিদ্যমান আছে।

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ্ (র) বলেছেন যে, চিন্তা-ভাবনা হলো একটা নূর যা তোমার অন্তরে প্রবিষ্ট হচ্ছে।

হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ (র) বলেন, যখন কোন লোক অধিক পরিমাণে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন সে বাস্তব বিষয়ের অবগতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে। আর যে লোক বাস্তব বিষয়কে উপলব্ধি করতে পারবে, সে-ই হবে জ্ঞানপ্রাপ্ত। আর যে জ্ঞানপ্রাপ্ত হবে, সে অবশ্যই আমলও করবে। ---(ইবনে-কাসীর)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) ইরশাদ করেছেন যে, কোন এক বুযুর্গ ব্যক্তি জনৈক আবিদ-পরহিযগার লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। আবিদ লোকটি এমন এক জায়গায় বসেছিলেন, যার এক পাশে ছিল একটি কবরস্থান আর অপর দিকে ছিল বাড়ীর ময়লা-আবর্জনার স্তূপ। পথ অতিক্রমকারীকে বুযুর্গ লোকটি বললেন, পৃথিবীর দুটি ভাণ্ডার তোমার সামনে বিদ্যমান। তার একটি হলো মানুষের ভাণ্ডার আর অপরটি হলো ধন-সম্পদের ভাণ্ডার, যা এ স্থানে পঙ্কিল আবর্জনার আকারে রয়েছে। এ দুটি ভাণ্ডারই শিক্ষার জন্য যথেষ্ট। ---(ইবনে-কাসীর)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নিজের আত্মার সংশোধনকল্পে শহর থেকে দূরে কোন বিরান-বিয়াবানে বেরিয়ে যেতেন এবং সেখানে গিয়ে اين اهلك (অর্থাৎ তোমার উপর যারা বাস করতো, তারা কোথায় গেল ?) বলে প্রশ্ন করতেন। তারপর নিজেই তার উত্তর দিতেন ঃ كل شيء هالك الا وجهه অর্থাৎ আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের সত্তা ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল। (ইবনে কাসীর) এভাবে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আখিরাতের স্মরণকে নিজের অন্তরে তাজা করতেন।

হযরত বিশরে-হাফী বলেছেন, মানুষ যদি আল্লাহর মাহাত্ম্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে পাপ ও নাফরমানী সংঘটিত হতে পারে না।

হযরত ঈসা (আ) ইরশাদ করেছেন, হে দুর্বলচিত্ত মানব! তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ্কে ভয় কর এবং পৃথিবীতে একজন মেহমানের মত বসবাস কর। মসজিদকে নিজের ঘর বানিয়ে নাও। চোখকে আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদতে, দেহকে সবর করতে আর অন্তরকে চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্ত করে তোল এবং আগামী কালের রিযকের চিন্তা পরিহার কর।

আলোচ্য আয়াতে এ চিন্তা-ভাবনাকেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির সর্বোৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ্র মা'-রেফাত লাভ এবং দুনিয়ার অস্থায়িত্বের বাস্তব জ্ঞান লাভ করা যেমন সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত, তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও স্বয়ং এই সৃষ্টির বাহ্যিক খুঁটিনাটি বিষয়ে জড়িয়ে গিয়ে তার দ্বারা প্রকৃত মালিকের পরিচয় অর্জন না করা সত্যসত্যই কঠিন মূর্খতা এবং অবুঝ শিশুসুলভ কাজ। এ প্রসঙ্গে মাওলানা রূমী বলেছেন ঃ

همه اندر زمن ترا زين است - كه تو طفلى وخانه رنگين است

আর এই দৃষ্টিহীনতাকেই হযরত মজযুব (র) এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

کچھہ بھی سمجھوں جو بصیرت تجھے حاصل ہو جائے
تو نے لیلیٰ جسے سمجھا ہے وہ محمل ہو جائے

কোন কোন মনীষী বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশ্বসৃষ্টিকে অন্বেষার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে না, তার অনীহার অনুপাতে তার দৃষ্টির প্রখরতা লুপ্ত হতে থাকে। বর্তমান কালের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং তাতেই যারা জড়িয়ে রয়ে গেছে, আল্লাহ্ এবং নিজেদের ব্যাপারে সে সমস্ত আবিষ্কর্তাদের গাফলতি উল্লিখিত বাণীরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বৈজ্ঞানিক উন্নতি যতই আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শৈল্পিক রহস্য উদ্‌ঘাটন করে চলেছে, ততই তারা আল্লাহ্‌র পরিচয় এবং বাস্তবতা অনুধাবনের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে পড়ছে। এ প্রসঙ্গে আকবর ইলাহাবাদী বলেছেন ঃ

بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو
بس خدا سمجھا ہے اس نے برق و بھاپ کو

কোরআনে-করীম এমনি দৃষ্টিহীন লেখাপড়া জানা মূর্খদের সম্পর্কে বলেছে ঃ

وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ○

অর্থাৎ 'আসমান ও যমীনে কতই না নিদর্শন রয়েছে যেগুলো থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে চলে। সেগুলোর তাৎপর্য, শিল্পবৈশিষ্ট্য এবং সেগুলোর বৈচিত্র্যের প্রতি তারা লক্ষ্যও করে না।'

সারকথা, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি ও সৃষ্ট জগতের উপর চিন্তা-গবেষণা করে তার মাহাত্ম্য ও কুদরত সম্পর্কে অবগত হওয়া একটি মহৎ ও উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। সেগুলোর মধ্যে গভীর মনোনিবেশ করে তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ না করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। উল্লিখিত আয়াতের শেষ বাক্যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহে চিন্তা-গবেষণা করার ফলাফল বাতলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন সৃষ্টির উপর যে লোক চিন্তা-ভাবনা করে সে লোক এই অবস্থায় না পৌঁছে পারে না যে, এসব বস্তু-সামগ্রীকে আল্লাহ্ নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি বরং এ সব সৃষ্টির পেছনে হাজারও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। সে সমস্তকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়ে মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, সমগ্র পৃথিবী তাদের কল্যাণের জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত-আরাধনার উদ্দেশ্যে। এটাই হলো তাদের জীবনের লক্ষ্য। তারপর তারা চিন্তা-গবেষণা করে এই তাৎপর্য আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছে যে, গোটা এ বিশ্বসৃষ্টি নিরর্থক নয়, বরং এগুলো সবই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অসীম কুদরত ও হিকমতেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পরবর্তীতে সে সমস্ত লোকের কয়েকটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনার উল্লেখ করা হয়েছে যা তারা নিজেদের পালনকর্তাকে চিনে নিয়ে তাঁর মহান দরবারে পেশ করেছিলেন।

প্রথম আবেদনটি ছিল এই যে, فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।

দ্বিতীয় আবেদন ঃ আমাদেরকে আখিরাতের লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি দান কর। কারণ, যাদেরকে তুমি জাহান্নামে প্রবিষ্ট করাবে, তাদেরকে সমগ্র বিশ্বের সামনে লাঞ্ছিত করা হবে। কোন কোন আলিম লিখেছেন, হাশরের মাঠের লাঞ্ছনা এমন এক আযাব হবে যার ফলে মানুষ কামনা করবে যে, হায় ! যদি তাকে জাহান্নামেই দিয়ে দেওয়া হতো, তবুও যদি তার অপকর্মের প্রচার গোটা হাশরের সামনে করা না হতো!

তৃতীয় আবেদন ঃ আমরা তোমার পক্ষ থেকে আগত আহ্বানকারী রসূলে-মকবুল (সা)-এর আহ্বান শুনেছি এবং তাতে ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের বড় গোনাহ্-গুলো ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের অন্যায় ও দোষ-ত্রুটি অপসারিত করে দাও। আর আমাদেরকে নেককার ও সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যু দান কর। অর্থাৎ তাঁদের শ্রেণীভুক্ত করে দাও।

এই তিনটি আবেদন ছিল আযাব, কষ্ট ও অনিষ্ট থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য। পরবর্তীতে চতুর্থ আবেদনটি করা হয়েছে কল্যাণ লাভ সম্পর্কে যে, নবী-রসূলগণের মাধ্যমে জান্নাতের নিয়ামতসমূহের যে প্রতিশ্রুতি তুমি দান করেছ, তা আমাদেরকে দান কর। কিয়ামতের দিন যেন লাঞ্ছনাও না হয়। অর্থাৎ প্রাথমিক জবাবদিহি ও বদনামীর পর মাফ করার পরিবর্তে প্রথম পর্যায়েই আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তুমি তো ওয়াদা ভঙ্গ কর না, কিন্তু এই আবেদন-নিবেদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আমাদেরকে এমন যোগ্যতা দান কর, যাতে আমরা তোমার সে ওয়াদা লাভের যোগ্য হতে পারি এবং শেষ পর্যন্ত যেন তাতে স্থির থাকতে পারি। আমাদের মৃত্যু যেন ঈমান ও আ'মালে সালেহার সাথে হয়।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن
ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن
دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن
عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ
كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ

الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ
لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ
وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

(১৯৫) অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবূল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না—তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সে সমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করাব জান্নাতে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়। (১৯৬) নগরীতে কাফিরদের চাল-চলন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়। (১৯৭) এটা হলো সামান্য ফায়দা---এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোযখ। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান। (১৯৮) কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা কিছু আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা সৎকর্মশীলদের জন্য একান্তই উত্তম। (১৯৯) আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর উপর, আল্লাহ্‌র সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে স্বল্প-মূল্যের বিনিময়ে সওদা করে না, তারাই হলো সে লোক যাদের জন্য পারিশ্রমিক রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যথাশীঘ্র হিসাব চুকিয়ে দেন।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে সৎকর্মশীল ঈমানদার লোকদের কতিপয় দোয়া-প্রার্থনার বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতগুলোতে সে দোয়ার মঞ্জুরি এবং তাদের সৎকর্মের জন্য বিপুল প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ আয়াতে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদের বাহ্যিক ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ এবং পার্থিব চলাফেরার প্রতি লক্ষ্য করে মুসলমানদের ধোঁকায় পড়া উচিত নয়। কারণ, তাদের এহেন অবস্থা সামান্য কয়েক দিনের জন্য মাত্র, তারপরেই রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারপর তাদের পালনকর্তা মঞ্জুর করে নিয়েছেন তাদের দোয়া। তার কারণ (আমার চিরাচরিত নিয়ম হলো এই যে,) আমি কারো (সৎ) কাজকে তোমাদের মধ্যে যেই তা করুক বিনষ্ট করি না। (তার বিনিময় দেওয়া হবে না, এমন নয়)। তা সে কাজ পুরুষই করুক কিংবা স্ত্রীলোক (উভয়ের জন্য একই নিয়ম। কারণ,) তোমরা (উভয়েই) পরস্পরের অংশ বিশেষ। (কাজেই উভয়ের জন্য হুকুমও একই রকম। যখনই সে ঈমান এনে বড় একটা সৎ কাজ করেছে এবং তার প্রেক্ষিতে আগত সুফল লাভের প্রার্থনা করেছে, তখন আমি তার দোয়া-প্রার্থনাকে আমার চিরাচরিত নিয়মের ভিত্তিতেই মঞ্জুর করে নিয়েছি। আর আমি যখন ঈমানের জন্য এমন সুফল দান করে থাকি,) তখন যারা (ঈমান এনেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কঠিন আমলগুলোও সম্পাদন করেছে, যেমন হিজরত করে) দেশত্যাগ করেছে এবং (তাও নিজের খুশীতে নয় ভ্রমণ-পর্যটনের জন্য নয়, বরং তাদেরকে চরমভাবে উত্যক্ত করে) বের করে দেওয়া হয়েছে। আর (হিজরত, নির্বাসন ও অন্যান্য) উৎপীড়ন সবই ভোগ করতে হয়েছে আমার পথে। (অর্থাৎ আমার দীনের কারণে এবং যেগুলোকে তারা সহ্য করেছে) আর (তদুপরি তারা) জিহাদ করেছে এবং (তাদের মধ্যে অনেকেই) শাহাদত বরণ করেছে। (কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিহাদ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেনি। কাজেই এহেন পরিশ্রমপূর্ণ সৎকর্মের জন্য সুফল প্রাপ্ত হবে নাই বা কেন?) নিশ্চয়ই তাদের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি (যা আমার হকের ব্যাপারে তাদের দ্বারা হয়ে গেছে) আমি তা ক্ষমা করে দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের এমন উদ্যানে প্রবিষ্ট করাব, যার তলদেশে প্রবাহিত থাকবে নহরসমূহ। এই প্রতিদান পাবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। আর আল্লাহ্‌র কাছেই আছে (অর্থাৎ তাঁরই ক্ষমতায় রয়েছে) উত্তম প্রতিদান। (উল্লিখিত আয়াতগুলোতে মুসলমানদের দুঃখ-কষ্টের এবং তার শুভ পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে কাফিরদের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস এবং সে সবের অশুভ পরিণতির কথা আলোচনা হচ্ছে, যাতে মুসলমানদের সান্ত্বনা এবং অসৎ কর্মীদের সংশোধন ও তওবার তৌফিক হতে পারে)।

(হে সত্যান্বেষী! রুযী-রোজগার কিংবা বিলাস ব্যসনের জন্য) কাফিরদের চলা-ফেরা যেন তোমাকে ভুল পথে পরিচালিত না করে, এটা যে কয়েক দিনের খেলামাত্র। (কারণ, মৃত্যুর সাথে সাথে এর নাম-নিশানা পর্যন্ত থাকবে না। আর) তারপরে তাদের (চিরকালীন) ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা হলো নিকৃষ্টতর অবস্থান। কিন্তু (এদের মধ্যে) যেসব লোক আল্লাহ্‌কে ভয় করবে (এবং কৃতজ্ঞ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে জান্নাতী উদ্যান। তার (প্রাসাদরাজির) তলদেশে প্রবাহিত থাকবে প্রস্রবণসমূহ। তারা এ সমস্ত উদ্যানে চিরকাল বসবাস করতে থাকবে। এই আতিথেয়তা হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। বস্তুত যেসব বস্তু আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে (অর্থাৎ উল্লিখিত স্বর্গীয় উদ্যান, প্রস্রবণ প্রভৃতি) তা সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য (কাফিরদের কয়েক দিনের ভোগ-বিলাস অপেক্ষা) অনেক উত্তম।

(উল্লিখিত প্রার্থনা সম্বলিত আয়াতের পূর্বে আহ্‌লে-কিতাবদের বদভ্যাসসমূহ এবং তাদের শাস্তি ও অশুভ পরিণতির বিষয় ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে

সে সমস্ত লোকের আলোচনা করা হয়েছে, আহলে-কিতাবদের মধ্য থেকে যাঁরা সৎকর্মশীল মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কাজেই কোরআনের সাধারণ রীতি অনুযায়ী মন্দ লোকদের দোষ-ত্রুটির পরে সৎ লোকদের প্রশংসার আলোচনা এসেছে)। আর নিশ্চয়ই কোন কোন লোক আহ্‌লে-কিতাবদের মাঝে এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী এবং সে কিতাবের প্রতিও (বিশ্বাস করে) যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে (অর্থাৎ কোরআনের প্রতি)। আর সে কিতাবের প্রতিও (বিশ্বাস করে) যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে (অর্থাৎ তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি। আর আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের যে বিশ্বাস, তা) এভাবে যে, তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে। (সে কারণেই তারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে না যে আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তান হওয়ার অপবাদ আরোপ করবে অথবা আহ্‌কামের ব্যাপারে কোন প্রকার অপবাদ আরোপ করবে! আর তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি তাদের যে বিশ্বাস এভাবে,) আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়াতসমূহের মুকাবিলায় (দুনিয়ার) স্বল্পমূল্য বিনিময় গ্রহণ করে না। এমন সব লোকেরাই উত্তম প্রতিদান পাবে তাদের পরওয়ারদিগারের কাছ থেকে (আর তাতে তেমন একটা বিলম্বও ঘটবে না। কারণ,) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা'আলা যথাশীঘ্র হিসাব-নিকাশ করে দেবেন। (আর এই হিসাব-নিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সবার দেনা-পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হিজরত ও শাহাদতের দ্বারা হক্কুল-ইবাদ ব্যতীত অন্য সব গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যায়ঃ ... ... لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ আয়াতের আওতায় তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, আল্লাহর হকের বেলায় যে সমস্ত ত্রুটি-গাফলতি ও পাপ-তাপ হয়ে থাকবে তা হিজরত ও শাহাদাতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। তার কারণ, স্বয়ং রসূলে করীম (সা) হাদীসে ঋণ-ধারকে এ থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। বরং তাঁর ক্ষমার নিয়ম হলো স্বয়ং পাওনাদার কিংবা তার ওয়ারিশানকে প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেবে। অবশ্য যদি কারো প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে পাওনাদারকে রাযী করিয়ে দেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। কারো কারো ব্যাপারে এমন হবেও বটে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝٢٠٠

(২০০) হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।

যোগসূত্র ঃ এটি সূরা আলে-ইমরানের সর্বশেষ আয়াত। এতে মুসলমানদের জন্য কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নসীহত নিহিত রয়েছে এবং এটিই যেন গোটা সূরার সার-সংক্ষেপ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! (কষ্ট ও বিপদাপদে) নিজে সবর কর এবং (কাফিরদের সাথে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে) মুকাবিলা করতে গিয়ে সর্বাবস্থায় সবর কর এবং যুদ্ধের (আশংকা দেখা দিলে,) মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক এবং (যে কোন অবস্থায়) আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক, (শরীয়তের নির্ধারিত সীমালংঘন করো না) যাতে করে তোমরা (আখিরাতে নিশ্চিতভাবে এবং দুনিয়ার কোন কোন ক্ষেত্রেও) পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করতে পার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতটিতে মুসলমানদের তিনটি বিষয়ে নসিহত করা হয়েছে। (১) সবর, (২) মুসাবারাহ (৩) মুরাবাতা ও (৪) তাকওয়া, যা এ তিনের সাথে অপরিহার্যভাবে যুক্ত।

'সবর'--এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা ও বাঁধা! আর কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় এর অর্থ নফসকে তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর জমিয়ে রাখা। এর তিনটি প্রকার রয়েছে।

এক—সবর আলাত্তাআত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল যে সমস্ত কাজের হুকুম করেছেন, সেগুলোর অনুবর্তিতা মনের উপর যত কঠিনই হোক না কেন তাতে মনকে স্থির রাখা।

দুই—সব্‌র 'আনিল মাআসী'। অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল নিষেধ করেছেন, সেগুলো মনের জন্য যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, যত স্বাদেরই হোক না কেন, তা থেকে মনকে বিরত রাখা।

তিন—সব্‌র আলাল মাসায়েব অর্থাৎ বিপদাপদ ও কষ্টের বেলায় সবর করা, ধৈর্য ধারণ করা, অধৈর্য না হওয়া এবং দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে আগত মনে করে মন-মস্তিষ্ককে সেজন্য অধৈর্য করে না তোলা।

'মুসাবারাহ্' শব্দটি সব্‌র থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ শত্রুর মুকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা। আর 'মুরাবাতা' অর্থ হলো, ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এ অর্থেই কোরআনে-করীমে বলা হয়েছে ঃ من رباط الخيل

কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) ইসলামী সীমান্তের হিফাযতে সুসজ্জিত হয়ে থাকা অপরিহার্য, যাতে ইসলামী সীমান্তের প্রতি শত্রুরা রক্তচক্ষু তুলে তাকাতেও সাহস না পায়।

(২) জামা'আতের নামাযের এমন নিয়মানুবর্তিতা করা যে, এক নামাযান্তেই দ্বিতীয় নামাযের জন্য অপেক্ষমান থাকা। এ দুইটি বিষয়ই ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মকবুল ইবাদত। এর মাহাত্ম্য অসংখ্য—অগণিত! এখানে কয়েকটি মাত্র লিখে দেওয়া হলো।

রিবাত বা ইসলামী সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা ঃ ইসলামী সীমান্তের হিফাযত করার লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষারত থাকাকেই 'রিবাত' ও 'মুরাবাতাহ' বলা

হয়। এর দুটি রূপ হতে পারে। প্রথমত যুদ্ধের কোন আশংকা নেই, সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত, এমতাবস্থায় শুধুমাত্র অগ্রিম হিফাযত হিসাবে তার দেখাশোনা করতে থাকা। এক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনসহ সেখানে (সীমান্তে) বসবাস করতে থাকা কিংবা চাষবাস করে নিজের রুযী-রোজগার করাও জায়েয। এমতাবস্থায় যদি সীমান্ত রক্ষাই নিয়ত হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থায় রুযী-রোজগার করা যদি তারই আনুষঙ্গিক বিষয় হয়, তবে এমন ব্যক্তিরও "রিবাত ফী সাবীলিল্লাহ্"র সওয়াব হতে থাকবে। তাকে যদি কখনও যুদ্ধ করতে না হয়, তবুও। কিন্তু প্রকৃত নিয়ত যদি সীমান্তের হিফাযত না হয়, বরং নিজের রুযী-রোজগারই হয় মুখ্য, তবে দৃশ্যত সীমান্ত রক্ষার কাজ করে থাকলেও এমন লোক 'মুরাবাত ফী সাবীলিল্লাহ্' হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্র ওয়াস্তে সীমান্ত রক্ষাকারী বলে গণ্য হবে না।

দ্বিতীয়ত, সীমান্তে যদি শত্রুর আক্রমণের আশংকা থাকে, তবে এমতাবস্থায় নারী ও শিশুদের সেখানে রাখা জায়েয নয়। তখন সেখানে তারাই থাকবে, যারা শত্রুর মুকাবিলা করতে পারে। ---(কুরতুবী)

এতদুভয় অবস্থাতে 'রিবাত' বা সীমান্ত রক্ষার অসংখ্য ফযীলত রয়েছে। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন---"আল্লাহ্র পথে একদিনের 'রিবাত' (সীমান্ত প্রহরা) সমগ্র দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে তাঁর সব কিছু থেকেও উত্তম।"

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে হযরত সালমান কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) বলেছেন, "একদিন ও এক রাতের রিবাত (সীমান্ত প্রহরা) ক্রমাগত এক মাসের রোযা এবং সমগ্র রাত ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া অপেক্ষাও উত্তম। যদি এমতাবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার সীমান্ত প্রহরার পর্যায়ক্রমিক সওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার রিযিক জারী থাকবে এবং সে শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে।"

আবূ দাউদ (র) ফুযালাহ্ ইবনে ওবায়েদ-এর রেওয়ায়েতক্রমে এ মর্মে এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় শুধুমাত্র মুরাবাত (ইসলামী সীমান্তরক্ষী) ছাড়া অর্থাৎ তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং সে কবরে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী থেকে নিরাপদ থাকবে।

এসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'রিবাত' বা সীমান্ত রক্ষার কাজটি সমস্ত সদকায়ে জারিয়া অপেক্ষাও উত্তম। কারণ, সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব ততক্ষণ পর্যন্তই চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সদকাকৃত বাড়ী-ঘর, জমি-জমা, রচিত গ্রন্থরাজি কিংবা ওয়াকফকৃত জিনিসের দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে। যখন এ উপকারিতা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার সওয়াবও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্র পথে সীমান্ত প্রহরার সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। কারণ, সমস্ত মুসলমানের সৎকর্মে নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব, যখন তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকবে। ফলে একজন সীমান্তরক্ষীর এ কাজ সমস্ত মুসলমানের সৎ কাজের কারণ হয়। সে কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত তার 'রিবাত' কর্মের সওয়াব অব্যাহত থাকবে। তাছাড়াও সে যত নেক কাজ দুনিয়ায় করতো, সেগুলোর সওয়াবও আমল করা ছাড়াই সর্বদা জারী থাকবে। যেমন, বিশুদ্ধ সনদসহ ইবনে মাজাহ গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসূলে-করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

من مات مرابطًا فى سبيل الله اجرى عليه اجر عمله الصالح الذى كان يعمله واجرى عليه رزقه وامن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة امنا من الفزع -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে দুনিয়ায় যে সমস্ত সৎ কাজ করতো তার সওয়াব সব সময় জারী থাকবে এবং তার রিযিকও জারী থাকবে এবং সে শয়তান (কিংবা কবরের সওয়াল-জওয়াব) থেকে বেঁচে থাকবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে এমন বিশেষভাবে ওঠাবেন যে, হাশরের ময়দানের কোন ভয়ভীতিই তার মধ্যে থাকবে না।

এই রেওয়ায়েতে যে সমস্ত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তার একটি শর্ত রয়েছে যে, তাকে সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু অন্যান্য কোন কোন রেওয়ায়েতের দ্বারা জানা যায় যে, সে জীবিত অবস্থায় তার সন্তান-সন্ততির কাছে ফিরে গেলেও সে সওয়াব জারী থাকবে।

হযরত উবাই ইবনে কা'আব রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, রমযান ছাড়া অন্যান্য দিনে একদিন মুসলমানদের কোন দুর্বল সীমান্ত রক্ষার কাজ নিঃস্বার্থভাবে সম্পাদন করার সওয়াব শতবর্ষের ক্রমাগত রোযা এবং রাত্রি জাগরণের চেয়েও উত্তম। আর রমযানের সময় একদিন সীমান্ত প্রহরার কাজ এক হাজার বছরের সিয়াম ও কিয়ামের চাইতে উত্তম। এখানে এ শব্দে সামান্য দোদুল্যমানতা প্রকাশ করার পর বর্ণনাকারী বলেন, আর যদি আল্লাহ্ অক্ষত অবস্থায় তাকে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়ে নেন, তবে এক হাজার বছর পর্যন্ত তার কোন পাপ লেখা হবে না। বরং পুণ্য লেখা হতে থাকবে এবং তার সীমান্ত রক্ষার কাজের বিনিময় কিয়ামত অবধি জারী থাকবে। ---(কুরতুবী)

নামাযের জামা'আতের অনুবর্তিতা ঃ আবূ সালমাহ্ ইবনে আবদুর রহমান কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন,---আমি তোমাদেরকে এমন কিছু বিষয় বলে দিচ্ছি যাতে আল্লাহ্ তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন এবং তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। সে বিষয়গুলো হচ্ছে এই ঃ ঠাণ্ডা কিংবা কোন ক্ষতের কারণে ওযূর অঙ্গগুলো ধোয়া কষ্টকর হলেও সে অঙ্গগুলোকে খুব ভালভাবে ধোয়া, অধিক পরিমাণে মসজিদের দিকে যাওয়া এবং এক নামায শেষ করার পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা। তারপর বলেন ঃ ذلكم الرباط অর্থাৎ এও আল্লাহ্র ওয়াস্তে সীমান্ত প্রহরার অনুরূপ।

জ্ঞাতব্য ঃ এ আয়াতে প্রথমে মুসলমানদেরকে সব্র করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রেই হতে পারে। আর এর বিস্তারিত বর্ণনা উপরে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত 'মুসাবারাহ্'-এর নির্দেশ করা হয়েছে যা কাফিরদের সাথে মুকাবিলার সময় হয়ে থাকে। তৃতীয়ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুরাবাতার, যা কাফিরদের সাথে মুকাবিলার আশংকার সময় হয়ে থাকে। আর সর্বশেষে দেওয়া হয়েছে তাকওয়া তথা পরহিযগারীর হুকুম; যা এ সমুদয় কাজের প্রাণ এবং আমল কবূল হওয়ার জন্য অপরিহার্য। শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহ্কামের ক্ষেত্রেই এসব বিষয় প্রযোজ্য। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে এসব আহ্কামের উপর আমল করার পুরোপুরি তওফীক দান করুন। আমীন।

সূরা আন্-নিসা

মদীনায় অবতীর্ণ, ১৭০ আয়াত, ২৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ
خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ①
وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۠ وَلَا
تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ②

পরম দয়ালু ও দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে!

(১) হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (২) ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালামালের সাথে ভালো মালামালের অদল-বদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয়, এটা বড়ই মন্দ কাজ।

যোগসূত্র ঃ সূরা আলে-ইমরানের সর্বশেষ আয়াতটি ছিল তাকওয়া সম্পর্কিত। আর আলোচ্য সূরা 'নিসা'ও শুরু হয়েছে তাকওয়ারই বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে।

প্রথমোক্ত সূরায় বিভিন্ন যুদ্ধ-জিহাদ, শত্রুপক্ষের সাথে আচার-আচরণ, যুদ্ধলব্ধ বস্তু-সামগ্রীর (গনীমতের মাল) অপচয় ও আত্মসাতের ভয়াবহ পরিণাম প্রভৃতি বর্ণনা করা

হয়েছে। আর আলোচ্য সূরার শুরুতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার সংক্রান্ত বিধান জারী করা হয়েছে। যেমন---অনাথ-ইয়াতীমের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও স্ত্রীদের অধিকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, হক্কুল-ইবাদ বা অন্যের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কতকগুলো অধিকার রয়েছে, যেগুলো সাধারণত দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় পড়ে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তা কার্যকর করা যেতে পারে।

সাধারণ ব্যবসায়-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও শ্রমের মজুরি প্রভৃতি এ জাতীয় অধিকার যা মূলত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে থাকে। এ সব অধিকার যদি কোন এক পক্ষ আদায় করতে ব্যর্থ অথবা সেক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার সুরাহা করা যেতে পারে।

কিন্তু সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, কারো নিজ বংশের ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক অধিকার আদায় হওয়া নির্ভর করে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার উপর। এ সব অধিকারকে তৌলদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। কোন চুক্তির মাধ্যমেও তা নির্ধারণ করা দুষ্কর। সুতরাং এ সব অধিকার আদায়ের জন্য আল্লাহ্ ভীতি এবং পরকালের ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উত্তম উপায় নেই। আর একেই বলা হয়েছে 'তাকওয়া'। বস্তুত এই তাকওয়া দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক শক্তির চেয়ে অনেক বড়। তাই আলোচ্য সূরাটিও তাকওয়ার বিধান দিয়ে শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ.....---অর্থাৎ হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণকে ভয় কর। সম্ভবত এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) বিয়ের খুতবায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন। বিয়ের খুতবায় এই আয়াতটি পাঠ করা সুন্নত।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এখানে 'হে মানবমণ্ডলী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে সমগ্র মানুষই---পুরুষ হোক অথবা মহিলা, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের হোক অথবা দুনিয়ার প্রলয় দিবস পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী---প্রতিটি মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

তাকওয়ার হুকুমের সাথে সাথে আল্লাহ্র অসংখ্য নামের মধ্যে এখানে 'রব' শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। অর্থাৎ এমন এক সত্তার বিরুদ্ধাচরণ করা কি করে সম্ভব হতে পারে, যিনি সমগ্র সৃষ্টি-লোকের লালন-পালনের যিম্মাদার এবং যার রবুবিয়াত বা পালন-নীতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে স্তরে দেদীপ্যমান!

এর পরই আল্লাহ্ তা'আলা মানব সৃষ্টির একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি বিশেষ কৌশল ও দয়ার মাধ্যমে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানব সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়া হতে পারতো, কিন্তু আল্লাহ্ একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন

করেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একটিমাত্র মানুষ তথা হযরত আদম (আ) থেকে সৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার সুদৃঢ় বন্ধন তৈরী করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌-ভীতি এবং পরকালের ভয় ছাড়াও এই ভ্রাতৃ বন্ধনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই যেন একে অন্যের অধিকারের প্রতি পুরোপুরি সম্মান প্রদর্শন করে এবং উঁচু-নীচু, আশরাফ-আতরাফ তথা ইতর-ভদ্রের ব্যবধান ভুলে গিয়ে যেন সবাই একই মানদণ্ডে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী করে নেয়।

اَلَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ০

অর্থাৎ সে মহাসত্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদের সকলকে একটি মানুষ তথা আদম (আ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। আদম থেকে সৃষ্টি করার অর্থ এই যে, প্রথমত হযরত আদম (আ)-এর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই যুগল থেকেই পৃথিবীর সকল মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

অতএব বলা যেতে পারে যে, এই আয়াতটি মূলত পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত আয়াত-সমূহের ভূমিকা হিসাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই ভূমিকায় একদিকে আল্লাহ্‌র অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে একই পিতার সন্তান হিসাবে গণ্য করে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

অতঃপর আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাঁর নাম উচ্চারণ করে তোমরা অন্যের থেকে অধিকার দাবী কর এবং যাঁর নামে শপথ করে অন্যের কাছ থেকে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে থাক। এ পর্যায়ে আরো বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক, তা পিতার দিক থেকেই হোক অথবা মায়ের দিক থেকেই হোক, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাক, তা আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন কর।

দ্বিতীয় আয়াতে ইয়াতীম শিশুদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তাকীদ করা হয়েছে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের বিধানও জারী করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (বিরুদ্ধাচরণকে) ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটিমাত্র প্রাণীসত্তা (অর্থাৎ হযরত আদম [আ] থেকে সৃষ্টি করেছেন (সমস্ত মানুষের সৃষ্টির মূল উৎস তিনিই)। আর সে প্রাণীসত্তা থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁর যুগল (অর্থাৎ আল্লাহ আদম থেকেই তাঁর সহধর্মিণী বিবি হাওয়াকে

সৃষ্টি করেছেন) এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই মানব-যুগল থেকেই অসংখ্য নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। আর (হে মানুষ! তোমাদেরকে এ ব্যাপারেও বিশেষ তাকীদ করা হচ্ছে যে,) তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌কে ভয় করবে যাঁর নামে শপথ করে তোমরা (নিজেদের অধিকার) আদায়ের চেষ্টা করে থাক। (অর্থাৎ তোমরা অন্যের কাছে নিজেদের অধিকার আদায় প্রসঙ্গে বলে থাক যে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে আমাদের অধিকার দিয়ে দাও। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য যখন অন্যদের আহবান করে থাক, তখন তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, তোমরা তাঁকে ভয় করা অপরিহার্য বলে মনে করে থাক। তাই তোমাদের বিশেষভাবে তাকীদ দেওয়া হচ্ছে এইজন্য যে, তোমরাও আল্লাহ্‌কে ভয় কর)। আর (এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র সমগ্র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখা। বস্তুত এখানে একটি বিশেষ ব্যাপার সতর্ক ও ভয় করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে এই যে,) আত্মীয়-স্বজনের অধিকার যাতে বিনষ্ট না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাক। আল্লাহ্‌ তোমাদের সবার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। (তোমরা যদি আল্লাহ্‌র বিধানের পরিপন্থী কিছু কর, তবে তার শাস্তি অবশ্যই পাবে।) এবং যে সব শিশুর পিতা মৃত্যুবরণ করে (অর্থাৎ, যারা ইয়াতীম হয়ে যায়) তাদের ধন-সম্পদের সংরক্ষণ করো (যাতে তা নষ্ট হয়ে না যায়। বরং তাদের ধনসম্পদ তাদের কাজেই খরচ কর। এছাড়া যতদিন পর্যন্ত সে সব ইয়াতীমের ধন-সম্পদ তোমাদের দায়িত্বে থাকে, সেগুলোকে সূক্ষ্মভাবে হিফাযত করো) এবং কোন ক্রমেই তাদের ভালো মালগুলো বেছে নিয়ে তার সাথে তোমাদের খারাপ মালগুলো সংমিশ্রিত করো না। আর তাদের ধন-দৌলত তোমরা কখনো ভোগ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নিজস্ব সম্পদ রয়েছে। (অবশ্য তোমরা যদি একান্তই নিঃস্ব হয়ে থাক, তাহলে তাদের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত কিছু পরিমাণ পারিশ্রমিক নেওয়া সঙ্গত হতে পারে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ঃ আলোচ্য সূরার সূচনাতেই আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। 'আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক' কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর দ্বারা সব রকম আত্মীয়ই বোঝানো হয়েছে। কালামে-পাকে 'আর্‌হাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলত একটি বহুবচনবোধক শব্দ। এর একবচন হচ্ছে 'রিহ্‌ম'। আর 'রিহ্‌ম' অর্থ জরায়ু বা গর্ভাশয় অর্থাৎ জন্মের প্রাক্কালে মায়ের উদরে যে স্থানে সন্তান অবস্থান করে। জন্মসূত্রেই মূলত মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদকে ইসলামী পরিভাষায়---'সেলায়ে-রিহ্‌মী' বলা হয়। আর এতে কোন রকম ব্যত্যয় সৃষ্টি হলে তাকে বলা হয় 'কেতয়ে-রিহ্‌মী'।

হাদীস শরীফে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মহানবী (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করে, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা।" ---(মিশকাত, পৃ. ৪১৯)

এ হাদীসে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক রাখার দুটি উপকারিতা বর্ণনা করা

হয়েছে। প্রথমত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক রাখলে পরকালে তো কল্যাণ লাভ হবেই, ইহকালেও সম্পদের প্রাচুর্য এবং আল্লাহ্‌র রসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘ-জীবন লাভের আশ্বাস সম্পর্কিত সু-সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রা) বলেন ঃ মহানবী (সা)-র মদীনায় আগমনের সাথে সাথে আমিও তাঁর দরবারে গিয়ে হাযির হলাম। সর্বপ্রথম আমার কানে তাঁর যে কথাটি প্রবেশ করল, তা হলো এই ঃ

يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الا رحام وصلوا با لليل والناس نيام تد خلوا الجنة بسلام ٥

---হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বেশী বেশী সালাম দাও। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষকে খাদ্য দান কর। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোল এবং এমনি সময় নামাযে মনোনিবেশ কর, যখন সাধারণ লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে। স্মরণ রেখো, এ কথাগুলো পালন করলে তোমরা পরম সুখ ও শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। ---(মিশকাত, পৃ. ১০৮)

অন্য এক হাদীসে আছে ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনাহ্ (রা) তাঁর এক বাঁদীকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর মহানবী (সা)-র নিকট যখন এ খবর পৌঁছালেন, তখন তিনি বললেন, 'তুমি যদি বাঁদীটি তোমার মামাকে দিয়ে দিতে, তাহলে বেশী পুণ্য লাভ করতে পারতে।' ---(মিশকাত, পৃ. ১৭১)

ইসলাম দাস-দাসীদের আযাদ করে দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছে এবং একে অতীব পুণ্যের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখাকে তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী (সা) এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন ঃ

الصدقة على المسكين صدقة وهى على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة ٥

---'কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করলে সদ্‌কার সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন নিকটাত্মীয়কে সাহায্য করলে একই সঙ্গে সদ্‌কা এবং আত্মীয়তার হক আদায়ের দ্বৈত পুণ্য লাভ করা যায়।' ---(মিশকাত, পৃ. ১৭১)

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের অধিকার আদায় যেমন অত্যন্ত পুণ্যের কাজ, তেমনি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকেও মহানবী (সা) অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে উল্লেখ করেছেন।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لا يدخل الجنة قاطع ---'যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'

---(মিশকাত, পৃ. ৪১৯)

لا تنزل الرحمة على قوم فيه قاطع رحم ○

---'যে কওমের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী কোন ব্যক্তি বিরাজ করবে, তাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হবে না।' ---(মিশকাত, পৃ. ৪২০)

আয়াতের শেষাংশে মানুষের অন্তরকে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে খুবই সচেতন ও পর্যবেক্ষণকারী। আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের ইচ্ছার কথাও ভালোভাবে অবগত রয়েছেন। কিন্তু যদি লোকলজ্জার ভয়ে অথবা সমাজ ও পরিবেশের চাপে পড়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে এর কোন মূল্য নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌কে ভয় করার কি তাৎপর্য রয়েছে, তাও অনুধাবন করতে কোন বেগ পেতে হয় না। কারণ, তাঁকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তিনি সর্বক্ষণই মানুষের আচার-আচরণ ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

কোরআনে-করীমের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে যে সব বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোকে দুনিয়ার সাধারণ আইন-কানুনের মতো বর্ণনা করা হয়নি।

কোরআনে বর্ণিত আইন-কানুনগুলোকে জনগণের হৃদয়গ্রাহী করার জন্য বিশেষ আন্তরিকতার সাথে এবং প্রশিক্ষণমূলক পন্থায় বর্ণনা করা হয়েছে। আইনগুলো বর্ণনা করার সাথে সাথে মানুষের মন-মানসিকতারও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে তাদের মধ্যে সেগুলোর গ্রহণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ইয়াতীমের অধিকার ঃ আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ঃ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ---ইয়াতীমের সম্পদ তাদেরকে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দাও। আরবী 'ইয়াতীম' শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিঃসঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটিমাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে 'দুররে-ইয়াতীম' বা 'নিঃসঙ্গ মুক্তা' বলা হয়ে থাকে।

ইসলামী পরিভাষায় যে শিশু-সন্তানের পিতা ইন্তিকাল করে, তাকে ইয়াতীম বলা হয়ে থাকে। অবশ্য জীব-জন্তুর ব্যাপারে এর বিপরীতভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, যে সব জীব-জন্তুর মা মরে যায়, তাদেরকে ইয়াতীম বলা হয়।

ছেলেমেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয় না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা) বলেছেন, 'বালেগ হবার পর আর কেউ ইয়াতীম থাকে না।' ---(মিশকাত, পৃ. ২৮৪)

ইয়াতীম যদি পারিতোষিক অথবা উপঢৌকন হিসাবে কিছু সম্পদ প্রাপ্ত হয়, তাহলে

ইয়াতীমের অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে সেসব মালেরও হিফাযত করা। ইয়াতীমের মৃত পিতা অথবা দেশের সরকার যে-ই উক্ত অভিভাবককে মনোনীত করুক না কেন, তার উপরই ইয়াতীমের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়। উক্ত অভিভাবকের উচিত, ইয়াতীমের যাবতীয় প্রয়োজন তার গচ্ছিত ধন-সম্পদ থেকে নির্বাহ করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ইয়াতীম বালেগ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে তার সম্পত্তি অর্পণ না করা। কারণ, বালেগ হওয়ার পূর্বে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পত্তি সংরক্ষণের মতো না হওয়াই স্বাভাবিক।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, ইয়াতীমের ধন-সম্পদ তার নিকট পৌঁছিয়ে দাও। আর এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বালেগ হলেই কেবল তার নিকট তার গচ্ছিত মালামাল পৌঁছিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

অতএব ইয়াতীমের মালামাল তার নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার পন্থা হল ইয়াতীমের মালামাল পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা এবং সে বালেগ হলে যথাসময় তার নিকট তার সম্পত্তি হস্তান্তর করা।

কোরআনের এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন অভিভাবক ব্যক্তিগতভাবে ইয়াতীমের মাল অপচয় ও আত্মসাৎ করবে না, এটাই যথেষ্ট নয়; বরং তার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে তার ধন-সম্পদের সার্বিক তত্ত্বাবধান করা এবং ইয়াতীম বালেগ না হওয়া পর্যন্ত তার নিজ দায়িত্বে তা সংরক্ষণ করা।

আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, ইয়াতীমের উত্তম সম্পদগুলো তোমাদের মন্দ সম্পদের সাথে অদলবদল করো না। অনেক লোক এমনও রয়েছে যে, সংখ্যার দিক দিয়ে কোন প্রকার পরিবর্তন না ঘটালেও ভালো ভালো জিনিসগুলো নিজেদের জন্য এবং মন্দগুলো ইয়াতীমের জন্য নির্ধারণ করে থাকে। যেমন, একপাল ছাগলের মধ্য থেকে মোটাতাজা এবং সবল ছাগলগুলো নিজেদের ভাগে এবং অত্যন্ত কৃশ ও দুর্বল ছাগলগুলো ইয়াতীমের জন্য বরাদ্দ করে থাকে। এমনিভাবে একটি অচল মুদ্রা ইয়াতীমের জন্য এবং ভালো মুদ্রাটি নিজের জন্য বন্টন করে। এটাও আত্মসাৎ এবং খেয়ানত বৈ আর কিছুই নয়। আর এ জন্যই কোরআন একান্ত স্পষ্ট করে ইয়াতীমের অধিকারগুলো সংরক্ষণের কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছে। এই ধরনের অদলবদল অথবা পরিবর্তন যেমন অভিভাবকের নিজের বেলায় চলে না, তেমনি অন্যের বেলায়ও অভিভাবককে এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকতে হবে, যাতে ইয়াতীম ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সূরার তৃতীয় বাক্যে বলা হয়েছে ঃ ইয়াতীমের ধন-সম্পদ নিজের ধন-সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করে খেয়ো না অর্থাৎ ইয়াতীমের মাল যাতে কেউ অবৈধ পন্থায় ভোগ করতে না পারে, সে জন্য এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। নিজের সম্পদের সাথে তোমরা ইয়াতীমের সম্পত্তি ভিন্নভাবে সংরক্ষণ করো এবং ভিন্নভাবে ব্যয় করো। আর যদি একত্রেও রাখ, তাহলে এমনিভাবে হিসাব-নিকাশ করে রাখবে, যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, তাদের মালামাল তোমাদের ব্যক্তিগত ভোগ-ব্যবহারে ব্যয় হয়নি। এর পূর্ণ ব্যাখ্যা সূরা বাকারার ২৭তম রুকূতে বর্ণনা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে প্রসঙ্গক্রমে এই কথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ ও ভোগ করার ক্ষেত্রে সাধারণত ঐ সব লোকই বেশী পাওয়া যায়, যাদের নিজস্ব ধন-সম্পদ রয়েছে। আর তাদের কথা এখানে উল্লেখ করে বস্তুত তাদের লজ্জা দেওয়া হয়েছে যে, কি করে এই ধরনের লোকেরা ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করতে পারে, যাদের আল্লাহ্ ধন-দৌলতের অধিকারী করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে ইয়াতীমের মালামাল ভক্ষণ করাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। ধন-সম্পদের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভোগ ও ব্যবহার। কিন্তু পরিভাষা হিসাবে ধন-সম্পদের ক্ষয় সাধন করাকেই ভক্ষণ বলা হয়ে থাকে। তা ব্যবহারের মাধ্যমেই হোক অথবা ভোগের মাধ্যমেই হোক। কোরআন এই পরিভাষাটিকে সামনে রেখেই 'ভক্ষণ করো না' বলে ইয়াতীমের সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেছে। সুতরাং ইয়াতীমের সম্পদ যে কোন অবৈধ পন্থায় ব্যয় করা নিষিদ্ধ।

আলোচ্য আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে ঃ 'এটা হবে মস্ত বড় অপরাধ।' এখানে 'হুবান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন—এ শব্দটি হাবশি ভাষা থেকে আগত, যার অর্থ হচ্ছে মস্ত বড় অপরাধ। আর আরবী ভাষায়ও এ শব্দটি সে অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অর্থাৎ ইয়াতীমের মালামাল সংরক্ষণ-ব্যবস্থার অভাবেই হোক অথবা অভিভাবক তার নিজের মালের সাথে সংমিশ্রিত করেই হোক, অপচয় ও আত্মসাৎ করলে তা হবে তার জন্য মস্ত বড় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ
مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَلَّا تَعُولُوا ۝

(৩) আর যদি তোমরা ভয় কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশংকা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই ; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে ; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।

যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত আয়াতে ইয়াতীমের হক বিনষ্ট করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, অভিভাবকগণের পক্ষে ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা হারাম। আলোচ্য আয়াতে কিছু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে পূর্বোক্ত নির্দেশটিই পুনরালোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যাদের অভিভাবকত্বে ইয়াতীম মেয়ে রয়েছে তারা যেন ওদের

এমন মতলব নিয়ে বিয়ে না করে যে, এদের যেনতেন মোহর দিয়ে বিয়ে করা যাবে এবং ওদের যেসব বিষয়-সম্পত্তি রয়েছে, তা গ্রাস করে নেওয়া যাবে !

মোট কথা, কোরআনের এ আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইয়াতীমদের সম্পদ আত্মসাৎ করার যে কোন ফন্দি-ফিকিরই নাজায়েয। পরন্তু অভিভাবকগণের উপর সর্বতোভাবে ইয়াতীমের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা ফরয।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যদি তোমাদের সামনে এমন কোন সম্ভাবনা উপস্থিত হয় (যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তবে তো কথাই নেই) যে, ইয়াতীম মেয়েদের ক্ষেত্রে (তাদের মোহরের বেলায়) সুবিচার করতে পারবে না (তবে তাদের বিয়ে করো না, বরং) তবে (হালাল) স্ত্রীলোকদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের নিকট (যে কোন দিক দিয়ে) পছন্দ হয়, তাদের বিয়ে কর (কেননা, অন্যান্য স্ত্রীলোক যেহেতু স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারবে ; তাও যারা একাধিক বিয়ে করতে চায়, তারা একজনে) দুজন পর্যন্ত স্ত্রীলোককে (অথবা একজনে) তিন জন স্ত্রীলোককে (অথবা একজনে) চারজন পর্যন্ত স্ত্রীলোককে (বিয়ে করতে পারে)। তবে যদি এরূপ সন্দেহ থাকে যে, (একাধিক বিয়ে করে স্ত্রীদের মধ্যে) ইনসাফ বজায় রাখতে পারবে না, (বরং কোন স্ত্রীর অধিকার বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিতে পারে,) তবে এমতাবস্থায় এক স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাক। (আর যদি মনে কর যে, এক স্ত্রীর অধিকারও পূরণ করা সম্ভব হবে না, তবে) যেসব ক্রীতদাসী (শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী) তোমাদের অধিকারে রয়েছে, তাতেই তৃপ্ত থাক। এমতাবস্থায় (এক স্ত্রী কিংবা শুধু ক্রীতদাসীতে তৃপ্ত থাকার বেলায়) সীমালংঘন বা অবিচার না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। (কেননা, এ অবস্থায় যেহেতু একই স্ত্রীর ব্যাপার, তাই অবিচার হওয়ার তেমন অবকাশ থাকে না। দাসীদের ব্যাপারে অবিচার হওয়ার আশংকা আরো কম। কেননা, এক্ষেত্রে মোহর দিতে হয় না। অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রেও তাদের স্ত্রীর সমান অধিকার থাকে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণ ঃ জাহিলিয়াত যুগে ইয়াতীম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ণ করা হতো। যদি কোন অভিভাবকের অধীনে কোন ইয়াতীম মেয়ে থাকতো আর তারা যদি সুন্দরী হতো এবং তাদের কিছু ধন-সম্পত্তি থাকতো, তাহলে তাদের অভিভাবকরা নামমাত্র মোহর দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করে নিতো অথবা তাদের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার ফিকির করতো। এসব অসহায় মেয়েদের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা তারা চিন্তাও করতো না।

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা)-র যুগে ঠিক এ ধরনের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি ইয়াতীম মেয়ে ছিল। সেই ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, যার মধ্যে উক্ত ইয়াতীম বালিকাটিরও

অংশ ছিল। সেই ব্যক্তি উক্ত মেয়েটিকে বিয়ে করে নিলো এবং নিজের পক্ষ থেকে 'দেন-মোহর' আদায় তো করলোই না, বরং বাগানে মেয়েটির যে অংশ ছিল তাও সে আত্মসাৎ করে নিলো। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

وَاِنْ خِفْتُمْ.....مِنَ النِّسَاءِ অর্থাৎ মেয়ের তো অভাব নেই ; বিয়ে যদি করতেই হয় তবে অন্য স্ত্রীলোকদের মধ্য থেকে একাধিক বিয়ে করতে পার।

নাবালেগের বিয়ে প্রসঙ্গে ঃ আলোচ্য আয়াতে যে 'ইয়াতামা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে ইয়াতীম মেয়ে। আর শরীয়তের পরিভাষায় সে বালক অথবা বালিকাকেই ইয়াতীম বলা হয়ে থাকে, যে এখনো বালেগ হয়নি। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, ইয়াতীমের অভিভাবকের ইখতিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে বালেগ হওয়ার আগেই তাদের বিয়ে-শাদী দিতে পারে। তবে তাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও কল্যাণকে সামনে রেখেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বয়সের সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। এমনি অনেক বড় বড় মেয়েকেও ছোট ছোট ছেলেদের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। ছেলের স্বভাব-চরিত্র যাচাই-বাছাই না করেই কোন একটি মেয়েকে তার নিকট সোপর্দ করা হয়---এটা কোনক্রমেই ঠিক হবে না।

এ ছাড়া এমন অনেক বালেগ অবিবাহিতা মেয়েও পাওয়া যায়, বিয়ের পূর্বেই যাদের বাপ মারা গেছে। এসব মেয়ে বালেগ হলেও মেয়ে-সুলভ লজ্জা-শরমের কারণে তাদের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের সামনে কোন প্রকার উচ্চ-বাচ্য করতে পারে না এবং অভিভাবক যা কিছু করে সেটাই তারা নতশিরে গ্রহণ করে নেয়। এমতাবস্থায় অভিভাবকদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে তাদের অধিকার কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ না হয়।

এ আয়াতে ইয়াতীম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ আইন-কানুনের মতো তা শুধু প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ্-ভীতির অনুভূতি জাগ্রত করাহয়েছে। তাই বলা হয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে কর, তাহলে ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করবে না ; বরং সে ক্ষেত্রে অন্য মেয়েকেই বিয়ে করে নেবে। এ কথা বলার সাথে সাথে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের কোন প্রকার অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয় সে ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বহু-বিবাহ ঃ বহু-বিবাহের প্রথাটি ইসলাম-পূর্ব যুগেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মমতেই বৈধ বলে বিবেচিত হতো। আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরান, মিসর, ব্যাবিলন প্রভৃতি সব দেশেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। বহু-বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত।

বর্তমানকালে ইউরোপের এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ বহু-বিবাহ রহিত করার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আসছেন বটে, কিন্তু তাতে কোন সুফল হয়নি। বরং তাতে

সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফল রক্ষিতার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থারই বিজয় হয়েছে। তাই আজকে ইউরোপের দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তার পুনঃপ্রচলন করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন।

ইউরোপের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মিঃ ডিউন পোর্ট বহু-বিবাহের একজন বড় প্রবক্তা। বহু-বিবাহের সমর্থনে তিনি পবিত্র ইনজীল কিতাবের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এ দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বহু-বিবাহ শুধু পছন্দনীয়ই নয়, বরং তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিশেষ উপকারিতাও রেখেছেন।

এভাবে ইউরোপের পাদরী নিকসন, জন মিল্টন এবং আইজাক টেইলর প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তি বহু-বিবাহ প্রথা চালু করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন; এমনকি পণ্ডিত ডিরাক অসংখ্য স্ত্রী রাখার পক্ষপাতী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী এক ব্যক্তি দশ থেকে সাতাশটি বিয়েও করতে পারবেন একই সময়ে।

কৃষ্ণকে হিন্দুরা তাদের পরম দেবতা বলে স্বীকার করে। সেই কৃষ্ণেরও দশ সহস্র স্ত্রী ছিল বলে বর্ণনা করা হয়।

মোট কথা, ধর্মীয় পবিত্রতা ও সামাজিক কাঠামো সুবিন্যস্ত রাখার তাকীদে এবং সমাজ থেকে জেনা ও ব্যভিচার প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপ নির্মূল করার স্বার্থে বহু-বিবাহ প্রথা একান্তই প্রয়োজন। এছাড়া অনেক সমাজে দেখা যায় যে, পুরুষের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যাই অধিক। বহু-বিবাহের মাধ্যমে এ সমস্যারও প্রতিকার হতে পারে।

বহু-বিবাহের সুযোগ না থাকলে সমাজে গণিকাবৃত্তি ও প্রমোদ-বালাদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। আর সত্য কথা এই যে, যেসব সমাজে বহু-বিবাহের অনুমতি নেই সেখানে ব্যভিচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেই।

আজকের ইউরোপীয় সমাজের দিকে লক্ষ্য করলেই আমরা এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারি। সেখানে বহু-বিবাহের উপর তো বিধি-নিষেধ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং মেয়ে-পুরুষের অবাধ মেলামেশার আবরণে জেনা ও এ জাতীয় অসামাজিক কার্যকলাপ চরমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এ জন্য তাদের কোন বাধেও না, বরং এর প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

মোট কথা, ইসলাম-পূর্ব যুগে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধর্ম এবং দেশের ইতিহাস থেকে এটা জানা যায় যে, এর প্রতি কোন প্রকার বাধা-নিষেধও ছিল না। ইহুদী, খৃস্টান, আর্য, হিন্দু এবং পারসিকদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও কোন সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। তবে সে সময় অগণিত বহু-বিবাহের জন্য অনেকের লোভ-লালসার অন্ত ছিল না। অন্যদিকে এ থেকে উদ্ভূত দায়িত্বের ব্যাপারেও তারা সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারত না, বরং এসব স্ত্রীকে তারা রাখত দাসী-বাঁদীর মত এবং তাদের সাথে যাচ্ছে-তা ব্যবহার করত। তাদের প্রতি কোন প্রকার ইনসাফ করা হত না। চরম বৈষম্য বিরাজ করত পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

অনেক সময়, পছন্দসই দু'একজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে অবশিষ্টদের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হত।

ইসলামের বিধানঃ কোরআন এই সামাজিক অনাচার এবং জুলুমের প্রতিরোধ করেছে। বহু-বিবাহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধও জারী করেছে। ইসলাম একই সময় চার-এর অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিশেষ তাকীদ দিয়েছে এবং ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম করা হলে তার জন্য শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে---তোমাদের পছন্দমত দুই, তিন অথবা চার জন স্ত্রীও গ্রহণ করতে পার।

আলোচ্য আয়াতে ما طاب (যা তোমাদের ভাল লাগে) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের এবং ইবনে মালেক (র) শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন ما حل শব্দ দ্বারা; যার অর্থ হচ্ছে, যেসব মেয়ে তোমাদের জন্য বৈধ। আর অনেক তফসীরকার উপরোক্ত শব্দটির শাব্দিক অর্থ 'পছন্দ' দ্বারাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। তবে উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে কোন প্রকার বৈপরীত্য নেই। অর্থাৎ এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, যেসব মেয়ে প্রকৃতিগতভাবে তোমাদের মনঃপূত এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হয় কেবল তাদেরকেই বিয়ে করতে পার।

আলোচ্য আয়াতে একাধিক অর্থাৎ চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার সুযোগ অবশ্য দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে এই চার পর্যন্ত কথাটি আরোপ করে তার উর্ধ্বসংখ্যক কোন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না বরং তা হবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ---তাও ব্যক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

মহানবী (সা)-র বর্ণনা দ্বারাও এ বিষয়টি অর্থাৎ চার পর্যন্ত সীমাবদ্ধকরণের কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর গায়লান বিন আসলামা সাকাফী নামে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন; তখন তাঁর দশ জন স্ত্রী ছিল। তাঁর স্ত্রীরাও তাঁর সাথে মুসলমান হয়ে গেলেন। মহানবী (সা) নির্দেশ দিলেন, এ দশজন স্ত্রীর মধ্য থেকে যে কোন চারজনকে রেখে বাকী সবাইকে যেন তালাক দিয়ে দেওয়া হয়। গায়লান বিন আসলামা সাকাফী রসূল (সা)-এর নির্দেশ মোতাবেক তাই করলেন। অর্থাৎ চার জন রেখে আর সবাইকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দিলেন। ---(মিশকাত, পৃ. ২৭৪, তিরমিযী ও ইবনে-মাযাহ)

মসনাদে-আহমদে এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছেঃ গায়লান বিন আসলামা শরীয়তের হুকুম মোতাবেক চারজন স্ত্রী রেখেছিলেন। কিন্তু হযরত উমর ফারূক (রা)-এর যুগে তিনি সে চারজন স্ত্রীকেও তালাক দিয়ে দেন এবং তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর ছেলেদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করে দেন। এ ব্যাপারটি হযরত উমর ফারূক (রা)-এর গোচরে এলে তিনি তাঁকে ডাকালেন এবং বললেন, "তুমি স্ত্রীদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যই এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছ যা একান্তই জুলুম। অতএব, তুমি শীঘ্র তাদেরকে পুনরায় গ্রহণ কর এবং তোমার সে ধন-সম্পদ তোমার ছেলেদের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে

তাদেরকে দিয়ে দাও। আর যদি এ ব্যবস্থা না কর তাহলে মনে রাখবে যে, এ জন্য তোমাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।"

কায়েস ইবনুল হারিস আসাদী (রা) বলেন ঃ আমি যখন মুসলমান হলাম, তখন আমার আট স্ত্রী ছিল। আমি ব্যাপারটি মহানবী (সা)-র গোচরীভূত করলাম। তিনি আমাকে চার জন স্ত্রী রেখে বাকী সবাইকে বিদায় করে দিতে বললেন। ---(আবূ দাউদ, পৃ. ৩০৪)

ইমাম শাফিয়ী (র) তাঁর মসনাদে নওফেল বিন মুয়াবিয়া দায়লামীর একটি ঘটনা নকল করেছেন। ঘটনাটি এরূপ যে, তিনি (দায়লামী) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর পাঁচ জন স্ত্রী ছিল। মহানবী (সা) তাঁকে একজন স্ত্রী তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এ ঘটনা মিশকাত শরীফের ২৭৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। হুযূর (সা)-এর এবং সাহাবীদের এরূপ আচরণ থেকে কোরআনের উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ সবার কাছেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আর তা হচ্ছে এই যে, চারজন স্ত্রীর অধিক সংখ্যক স্ত্রী একসঙ্গে রাখা কোনক্রমেই বৈধ নয়।

বহু-বিবাহ ও মহানবী (সা) ঃ আমরা জানি মহানবী (সা)-র আগমন ছিল পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। তাঁর আগমনের মূল লক্ষ্যই ছিল আল্লাহ্‌র দীনের প্রচার ও প্রসার, মানুষকে কলুষমুক্ত করে তার মুক্তি সাধন এবং আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কালামের বাণীকে বিশ্ব-মানবের দ্বারে পৌঁছিয়ে দেওয়া। তিনি ইসলামের মহান শিক্ষাকে কথা ও কাজে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মানব জীবনের এমন কোন একটি অধ্যায় বা বিভাগ নেই, যেখানে মহানবী (সা)-র হেদায়েত ও পথ-প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। জামাত-বদ্ধভাবে নামায আদায় করা থেকে শুরু করে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পরিবার-পরিজনের লালন-পালন, এমনকি পায়খানা-প্রস্রাব এবং পবিত্রতা অর্জনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

পারিবারিক জীবনে গৃহাভ্যন্তরের যাবতীয় কাজকর্ম, স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক, বাইরে থেকে ঘরে প্রত্যাবর্তন করে অপেক্ষমান মহিলাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দান অর্থাৎ এভাবে হাজারো প্রশ্নের সমাধান শুধু মহানবী (সা)-র স্ত্রীদের মাধ্যমেই উম্মত লাভ করতে পেরেছে।

ইসলামের শিক্ষা ও প্রচারকাজের পরিপ্রেক্ষিতেই মহানবী (সা)-র জন্য বহু-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ছিল। একমাত্র হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র মাধ্যমেই দু'হাজার দু'শ দশটি হাদীস আমরা লাভ করতে পেরেছি যা হাদীস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এছাড়া হযরত উম্মে সালমা (রা) তিনশ আটাত্তরটি হাদীস বর্ণনা করে গেছেন।

হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (রা) 'আলামুল-মুয়াক্কেয়ীন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৯ম পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন যে, 'যদি হযরত উম্মে-সালমা (রা)-র বর্ণিত ফতওয়াসমূহ সংকলন করা হয়, তা হলে একটি বিরাট গ্রন্থ তৈরী হতে পারে। তিনি মহানবী (সা)-র ইন্তিকালের পর বিভিন্ন লোকের প্রশ্নের জবাবে এসব ফতওয়া দিয়েছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা)-র হাদীস বর্ণনা এবং তাঁর প্রদত্ত ফতওয়া সম্পর্কে এখানে কিছু উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় দু'শ। হযরত রসূলে-করীম

(সা)-এর ইন্তিকালের পর আটচল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের কাজে মশগুল ছিলেন।

শুধু দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে মহানবী (সা)-র দু'জন স্ত্রীর কথা উল্লেখ করা হলো। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য স্ত্রীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাও কম নয়।

দুনিয়ার ভোগবাদী মানুষের সাথে নবী-রসূলদের কোন তুলনাই হয় না। কারণ, নবী ও রসূলদের লক্ষ্য ছিল গোটা বিশ্ব-মানবের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত এবং পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের সংশোধন করা। আর পৃথিবীর ভোগসর্বস্ব মানুষেরা নিজেদের ওপর ধারণা করেই সর্ববিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

অথচ অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় নাস্তিক এবং বস্তুবাদীরা হুযূর (সা)-এর বহু-বিবাহের ব্যাপারটিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আসছে। তাদের মতে (নাউযুবিল্লাহ্) যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্যই তিনি এমনটা করেছেন। কিন্তু মহানবী (সা)-র জীবনপদ্ধতির প্রতি যদি কোন চিন্তাশীল লোক একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তাহলে তাঁর একাধিক বিয়ের ব্যাপারটি নিয়ে এভাবে চিন্তা করতে পারবেন না। কারণ, তাঁর জীবন যাপন পদ্ধতিই প্রমাণ করে দেবে যে, তিনি এ উদ্দেশ্যে তা করেন নি।

তাঁর জীবন কুরায়শ তথা আরব-জাহানের সম্মুখে উন্মুক্ত ছিল। জীবনের পঁচিশ বছর বয়সে তিনি এমন একজন বিধবা মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন যাঁর এর পূর্বে আরও দুজন স্বামী মারা গিয়েছিল এবং তাঁর সাথে দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর্যন্ত তিনি ঘর-সংসার করেন। পূত-চরিত্রের অধিকারিণী বলে আরবে যাঁর পরম সুখ্যাতিও ছিল। মজার কথা এই যে, তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার পর অনেক সময় মাসের পর মাস তিনি হেরা পর্বত গুহায় আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন থাকতেন ; আরবের কে এই ঘটনা না জানে ?

এর পর যে সব বিয়ে হয়েছে, তা পঞ্চাশ বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পরই হয়েছে। এই পঞ্চাশ বছর এবং বিশেষ করে তাঁর যৌবনকাল সমস্তই মক্কাবাসীদের চোখের সামনে অতিক্রান্ত হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে মক্কার কোন শত্রুও তাঁর চরিত্রের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করতে পারেনি। তাঁর শত্রুরা তাঁকে অবশ্যই যাদুকর, উন্মাদ প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করেছিল, কিন্তু তাঁকে ভোগসর্বস্ব বা তাঁর মধ্যে কোন যৌনবিকারগ্রস্ততা আছে, এমন মিথ্যা দাবী তারা কখনও করতে পারেনি।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতেই আমরা চিন্তা করতে পারি যে, জীবনের পঞ্চাশটি বছর দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-বিলাসিতা হতে পবিত্র থেকে অবশেষে শেষ জীবনে তিনি কি উদ্দেশ্যে পর পর কয়েকটি বিয়ে করতে বাধ্য হন। তা হলে যে কোন সুস্থ এবং নিরপেক্ষ বিবেকসম্পন্ন মানুষই নিশ্চয় বলবেন যে, বিশেষ কোন কারণেই তিনি বহু-বিবাহের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। বহু-বিবাহ কিভাবে হলো তার সঠিক তথ্যও আমাদের জানা থাকা দরকার।

পঁচিশ বছর থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত একমাত্র হযরত খাদীজাতুল-কোবরা তাঁর জীবনসঙ্গিনী হিসেবে থাকেন। অতঃপর হযরত খাদিজাতুল-কোবরা ইন্তিকাল করলে তিনি

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ও হযরত সাওদা (রা)-কে বিয়ে করেন। বিয়ের পর বিবি সাওদা মহানবী (সা)-র ঘরে চলে আসেন, কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) অল্পবয়স্কা হওয়ার কারণে তাঁর পিতার গৃহেই অবস্থান করেন।

অতঃপর হিজরী দ্বিতীয় সালে মদীনা শরীফে হযরত আয়েশা (রা) নবীর সন্নিধানে আসেন। এ সময় মহানবী (সা)-র বয়স হয়েছিল চুয়ান্ন বছর। আর এ বয়সেই তাঁর নুজন স্ত্রী একত্রিত হলেন। আর এখান থেকেই তাঁর বহু-বিবাহ শুরু হয়। এর এক বছর পর হযরত হাফসা (রা)-র সাথে তাঁর বিয়ে হয়। এর কয়েক মাস পরেই হযরত জয়নব বিনতে খোযায়মাকে তিনি বিয়ে করেন। হযরত জয়নব (রা) আঠার মাস মহানবী (সা)-র সঙ্গে জীবন-যাপন করার পর ইন্তিকাল করেন। অবশ্য অন্য একটি বর্ণনা মতে তিনি তিন মাস পর ইনতেকাল করেন। অতঃপর চতুর্থ হিজরীতে মহানবী (সা) হযরত উম্মে সালমা (রা)-কে বিয়ে করেন এবং এরপর পঞ্চম হিজরীতে তিনি জয়নব বিনতে জাহ্শ (রা)-কে বিয়ে করেন। তখন তাঁর বয়স আটান্ন বছরে উপনীত হয়েছে। আর এই বয়সেই তাঁর চার জন স্ত্রী একত্রিত হয়েছেন। অথচ মুসলমানদের যখন একত্রে চার বিয়ে করার অনুমতি ছিল হযরত তখন থেকেই ইচ্ছে করলে চার বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি।

এরপর ষষ্ঠ হিজরীতে হযরত (সা) জুয়ায়রিয়া (রা)-কে, ৭ম হিজরীতে হযরত উম্মে হাবিবা (রা)-কে এবং একই বছর হযরত সাফিয়া ও হযরত মায়মুনা (রা)-কে বিয়ে করেন।

মোট কথা, জীবনের ৫৪টি বছর পর্যন্ত মহানবী (সা) একজন স্ত্রী নিয়েই ঘর-সংসার করেছেন। অর্থাৎ পঁচিশ বছর হযরত খাদীজাতুল-কোবরা (রা)-কে নিয়ে এবং চার-পাঁচ বছর হযরত সাওদা (রা)-কে নিয়ে সংসার করেন। এরপর আটান্ন বছর বয়সে তাঁর চারজন স্ত্রী একত্রিত হন। এ ছাড়া অন্যান্যকে পরবর্তী দু'তিন বছরে বিবাহসূত্রে গ্রহণ করেন।

বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এসব স্ত্রীর মধ্যে কেবলমাত্র হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-ই অপ্রাপ্ত বয়সে কুমারী হিসেবে নবী (সা)-র সন্নিধানে আসেন। এ ছাড়া অন্য সবাই ছিলেন বিধবা, যাদের কারো কারো পূর্বে দুজন স্বামীও অতিবাহিত হয়েছিল।

একথা কে না জানে যে, সাহাবায়ে-কিরাম পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সবাই ছিলেন মহানবী (সা)-র ব্যাপারে নিবেদিতপ্রাণ। এমতাবস্থায় তিনি চাইলে উল্লিখিত সংখ্যক কুমারী মেয়েকেই স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন। এমনকি দু'মাস অন্তর অন্তর তিনি ইচ্ছা করলে স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি।

মহানবী (সা) ছিলেন আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ। আর আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষরা কখনো কোন মনগড়া কাজ করতে পারেন না। যা কিছু করেন আল্লাহ্র নির্দেশেই করেন। নবীকে নবী হিসেবে মেনে নেওয়ার পর এ জাতীয় বিতর্কের অবকাশ থাকে না। আর যদি কেউ তাঁকে নবী হিসেবে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করে অর্থাৎ না মানে এবং এই অভিযোগ আনে যে, তিনি যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্যই একাধিক বিয়ে করেছিলেন, তাহলে তাকে কোরআনের সে আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, যেখানে তাঁর নিজের উপরও

বিধি-নিষেধের কথা বলা হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে এই ঃ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ

অর্থাৎ হে নবী ! এরপর আপনার জন্য আর কোন স্ত্রী বৈধ নয়। আর এ আয়াতটিও নিঃসৃত হয়েছে মহানবী (সা)-র মুখ থেকে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা) যা কিছু করেছেন তা সবই ছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশে।

হযরত (সা)-র বহু-বিবাহের কারণে ইসলামের প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক কল্যাণ হয়েছে তার হিসাব করা কঠিন। হাদীসের গ্রন্থসমূহই তার প্রকৃষ্ট সাক্ষী।

হযরত উম্মে সালমা (রা)-র স্বামী আবূ সালমার মৃত্যুর পর হযরত (সা) তাঁকে বিয়ে করেন। উম্মে সালমা তাঁর ভূতপূর্ব স্বামীর সবকটি ছেলে-মেয়েসহ নবীর গৃহে চলে আসেন। মহানবী (সা) সেসব ছেলে-মেয়ে অতীব যত্নের সাথে লালন-পালন করেন। নবীর স্ত্রীগণের মধ্যে শুধু উম্মে-সালমাই পূর্ব স্বামীর ঘরের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসেন। এটাও উম্মতের জন্য একটা শিক্ষা যে, বিধবাকে গ্রহণ করার সাথে সাথে তার পূর্ব স্বামীর ছেলে-মেয়েদের-কেও প্রয়োজনবোধে লালন-পালন করে, তাদেরকে মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। উম্মে-সালমার ছেলে হযরত উমর বিন আবি সালমা বলেন ঃ আমি মহানবী (সা)-র আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয়েছি। একবার তাঁর সাথে খেতে বসেছি। আমি খাবারের থালার চতুর্দিক থেকে লোকমা গ্রহণ করছিলাম। এই অবস্থা দেখে নবী করীম (সা) অত্যন্ত আদর করে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে খাও, ডান হাতে এবং থালার সম্মুখ ভাগ থেকে খাও।

—(মিশকাত, পৃ, ৩৬৩)

আর একটি ঘটনা ঃ হযরত জুয়ায়রিয়া (রা) এক যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসেন। অন্য বন্দীদের মতো তিনিও বণ্টিত হন। সাবেত বিন কায়েস অথবা তাঁর চাচাতো ভাইয়ের ভাগে তিনি পড়েন। অতঃপর তিনি তাঁর মুনিবের সাথে এমনি আচরণ করতে থাকেন যাতে তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত হয়। তিনি তাঁর মুনিবকে সম্মত করে সম্পদের বিনিময়ে মুক্তি লাভের পন্থা অবলম্বন করেন।

এরপর হযরত জুয়ায়রিয়া মহানবী (সা)-র নিকট এ সংবাদ নিয়ে আগমন করেন এবং তাঁর কাছ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহানবী (সা) তাঁকে সাহায্য করতে সম্মত হন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হযরত জুয়ায়রিয়া (রা) ছিলেন গোত্রপতির কন্যা এবং সে গোত্রের সহস্রাধিক লোক সাহাবী (রা)-দের হাতে বন্দী হয়ে এসেছিল। এরপর সাহাবীরা যখন জানতে পারলেন যে, জুয়ায়রিয়া (রা)-র সাথে হযরতের বিয়ে হয়েছে, তখন তাঁরা মহানবী (সা)-র সম্মানে স্ব স্ব দাস-দাসীদের মুক্ত ও বিদায় করে দেন। এতেই বোঝা যায়, মহানবী (সা)-র প্রতি সাহাবী (রা)-দের কতখানি প্রগাঢ় আনুগত্য ও সম্মান ছিল। এই ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা)-র একটি হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন ঃ "হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-কে বিয়ে করার কারণে বনি মুসতালিক গোত্রের শত শত ঘর আযাদ হয়ে গিয়েছিল। একটি গোত্রের জন্য জুয়ায়রিয়া (রা)-র মতো অন্য কোন ভাগ্যবতী মহিলা অন্তত আমার নজরে পড়েনি।"

হযরত উম্মে হাবিবা (রা) ইসলামের প্রাথমিক যুগেই তাঁর স্বামীর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ই কাফেলার অন্যান্য লোকের সাথে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে যান। সেখানে কিছু দিন পর তাঁর স্বামী মৃত্যুবরণ করেন।

মহানবী (সা) এ সংবাদ শুনে নাজ্জাশীর মাধ্যমে তাঁর কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠান। হযরত উম্মে-হাবিবা সে পয়গাম গ্রহণ করার পর নাজ্জাশী নিজে উকিল হয়ে তাঁকে হযরতের নিকট বিয়ে দিয়ে দেন।

মজার ব্যাপার এই যে, হযরত উম্মে হাবিবা (রা) ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ সুফিয়ানের কন্যা। আর আবূ সুফিয়ান তখন সে গোত্রেরই নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, যে গোত্রের লোকেরা ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণ করাই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নির্ধারণ করে রেখেছিল।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আবূ সুফিয়ান এক সময়ে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর অনুসারীদের উত্যক্ত করার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগিয়েছেন। তিনি মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ব্যাপারে কোন মওকাই হাতছাড়া করেন নি।

এমন এক মুহূর্তে মহানবী (সা) হযরত উম্মে হাবিবাকে বিয়ে করেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই বিয়ের কথা শোনার পর আবূ সুফিয়ানের মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন---মুহাম্মদ (সা) নিঃসন্দেহে সম্মানিত ব্যক্তি ; তাঁকে অসম্মানিত করা মোটেই সহজ কাজ নয়। একদিকে তাঁকে এবং তাঁর সংগীদেরকে পর্যুদস্ত করার জন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি আর অন্যদিকে সে মুহূর্তেই তিনি আমার কন্যাকে বিয়ে করলেন !

মোদ্দাকথা, এ বিয়ের কারণে মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হলো এবং ইসলামের মুকাবিলায় কাফিরদের শ্রদ্ধেয় নেতার মানসিক বল অনেকটা ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়লো।

এ বিয়ের কারণে ইসলাম এবং মুসলমানদের যে রাজনৈতিক বিজয় হলো, তা মোটেই কম গুরুত্বের নয়। আর নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষ মহানবী (সা) সে দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখেই এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

এখানে সামান্যই আলোকপাত করা হলো। এ ছাড়া ইতিহাসের যে কোন নিরপেক্ষ এবং চিন্তাশীল পাঠকই মহানবী (সা)-র বহু-বিবাহের তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা স্বীকার করে থাকবেন। এ প্রসঙ্গে পাঠকদেরকে আরো বিস্তারিত জ্ঞান আহরণের জন্য كثرت ازدواج لصاحب المعراج নামক গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে অনুরোধ করবো।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কিছুসংখ্যক খোদাদ্রোহীর বিস্তারকৃত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করার জন্য আমি শুধু সংক্ষেপে এখানে কিছু বক্তব্য পেশ করলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এতে কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। আমার এ লেখার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তাদের সাথে সাথে অজ্ঞতাবশত কিছু সংখ্যক বিভ্রান্ত মুসলিম চিন্তাশীল ব্যক্তিও এই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পড়ছেন। আসলে তারা মূলত মহানবী (সা)-র জীবন-চরিত এবং ইসলামের সুমহান শিক্ষা

থেকে একান্তই বঞ্চিত। আর ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছেন, তাও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের খোদাদ্রোহী লোকদের কাছ থেকেই অথবা তাদের প্রণীত গ্রন্থাবলী থেকেই।

যদি সমতা রক্ষা করা সম্ভব না হয়ঃ চারটি পর্যন্ত বিয়ের অনুমতি দেওয়ার পর বলা হয়েছে ঃ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ○

অর্থাৎ যদি আশংকা কর যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক।

পবিত্র কোরআনে চারজন স্ত্রীর কথা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বিধান তথা ন্যায়বিচার করতে না পার, তাহলে এক স্ত্রীর উপরেই নির্ভর কর। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে, যখন শরীয়ত মোতাবেক সবার সাথে সমান আচরণ করা হবে, তাদের সবার অধিকার সমভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে অপারক হলে এক স্ত্রীর উপরই নির্ভর করতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ।

জাহিলিয়াত যুগে এক ব্যক্তি একাধিক স্ত্রী রাখতো কিন্তু সবার সাথে সমতাপূর্ণ ব্যবহার করার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতো না। এ প্রসঙ্গে আয়াতের শুরুতে হাওয়ালাসহ আলোচিত হয়েছে। কোরআনে-করীম স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিচ্ছে যে, যদি সদ্ব্যবহার বজায় রাখতে না পার, তবে এক স্ত্রী নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হবে অথবা ক্রীতদাসী নিয়ে সংসারধর্ম পালন করবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আয়াতে যে ক্রীতদাসীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা শরীয়তের বিধি-নিষেধ সাপেক্ষ হতে হবে। আজকালকার যুগে যেহেতু সেসব বিধান অনুযায়ী দাসীর অস্তিত্ব নেই, সেহেতু এ যুগে বিবাহ-বন্ধন ব্যতীত কোন স্ত্রীলোক নিয়ে সংসার ধর্ম পালন করা সম্পূর্ণ অবৈধও হারাম।

মোট কথা, কোরআন যদিও চারটি পর্যন্ত স্ত্রীলোককে একসাথে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে এবং কেউ এরূপ বিয়ে করলে তা শুদ্ধও হবে, তবে একাধিক বিয়ের বেলায় স্ত্রীদের সবার সাথে সমতাপূর্ণ ব্যবহার করা ওয়াজিব করা হয়েছে। এ নিয়মের অন্যথা করা কঠিন গোনাহ্‌র কাজ। সুতরাং কেউ একের অধিক বিয়ে করতে চাইলে তাকে প্রথমে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, প্রত্যেক স্ত্রীর হক পুরা করার মত সামর্থ্য তার রয়েছে কি না! যদি এরূপ সামর্থ্য না থাকে, তবে একের অধিক বিয়ে করতে যাওয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে একটা কঠিন পাপে নিমজ্জিত করারই নামান্তর। এরূপ গোনাহর আশংকা থেকে বিরত থাকা এবং এক স্ত্রীতেই তুষ্ট থাকা তার পক্ষে বিধেয়।

অন্য কথায়, কেউ যদি একই সঙ্গে একই ঈজাব-কবূলের মাধ্যমে চারের অধিক স্ত্রী-লোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে সব কজনের বিয়েই বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, চারের অধিক বিয়ে করার কোন অধিকারই নেই। আর যদি স্ত্রীর সংখ্যা চারের ভেতরে

সীমিত থাকে, তবে সে বিয়ে হয়ে যাবে। তবে স্ত্রীদের মধ্যে যদি সমতাপূর্ণ ব্যবহারের দায়িত্ব পালন করতে না পারে, তবে কঠিন গোনাহগার হবে। যে স্ত্রীর হক বিনষ্ট হবে, সে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে তার অধিকার আদায় করে নিতে পারবে।

রসূলে-করীম (সা) একাধিক স্ত্রীর বেলায় সবার সাথে পরিপূর্ণ সমতার ব্যবহার করার ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকীদ করেছেন এবং যারা এর খেলাফ করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির খবর দিয়েছেন। নিজের ব্যবহারিক জীবনেও তিনি এ ব্যাপারে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করে দেখিয়েছেন। এমনকি তিনি এমন বিষয়েও সমতাপূর্ণ ব্যবহারের আদর্শ স্থাপন করেছেন যে ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল না।

এক হাদীসে হুযূর (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে সে এমনভাবে উঠবে যে, তার শরীরের এক পার্শ্ব অবশ হয়ে থাকবে।

---(মিশকাত শরীফ, পৃ. ২৭৮)

তবে ব্যবহারে সমতা রক্ষা করা শুধুমাত্র সে সমস্ত ব্যাপারেই জরুরী, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত। যেমন খরচপত্র প্রদান, একত্রে বসবাস ইত্যাদি। আর যেসব বিষয় মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়, যথা---অন্তরের আকর্ষণ যদি কোন একজনের প্রতি বেশী হয়ে যায়, আর এ বিশেষ আকর্ষণের প্রভাব যদি সাধ্যায়ত্ত বিষয়াদির উপর বিস্তার না করে, তবে অবশ্য কোন অপরাধ হবে না।

রসূলে-করীম (সা)-ও সাধ্যায়ত্ত ব্যাপারে পরিপূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠা করার পর যা সাধ্যের বাইরে, সে বিষয়ের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে এই বলে দোয়া করেছেন ঃ

اللهم هذا قسمى فيما املك فلا تلمنى فيما تملك ولا املك ٥

অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ্ ! যেটা আমার সাধ্যায়ত্ত সেটা আমি সমভাবে বন্টন করেছি। আর ঐ বস্তু, যা আপনার করায়ত্ত আমার সাধ্যে নয়, সেটার জন্য আমাকে যেন অপরাধী করবেন না।

আল্লাহ্‌র একজন মা'সুম রসূল (সা) পর্যন্ত যে ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা রাখতেন না, সে ব্যাপারে অন্য কেউ কিভাবে সমতা বজায় রাখতে পারবে? এজন্যই কোরআনের অপর এক আয়াতে মানুষের ক্ষমতাবহির্ভূত এ বিষয়টির উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ٥

অর্থাৎ স্ত্রীদের মধ্যে তোমরা কোন অবস্থাতেই সমতা রক্ষা করতে সক্ষম হবে না।

এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, ভালবাসা ও অন্তরের আকর্ষণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার নয়। তাই এ অসাধ্য বিষয়টিতেও সমতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অতঃপর বলা হয়েছে ঃ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ অর্থাৎ কোন এক স্ত্রীর প্রতি যদি তোমার আন্তরিক আকর্ষণ বেশী হয়ে যায়, তবে সেটা তোমার সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার নয় বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অন্য-

জনের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করা জায়েয হবে না। আলোচ্য আয়াতে فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً অর্থাৎ যদি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখতে পারবে না বলে ভয় কর, তবে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাক, বলে সে সমস্ত ব্যাপারেই ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত। এসব ব্যাপারে বেইনসাফী মহাপাপ। আর যাদের এরূপ পাপে জড়িত হওয়ার আশংকা রয়েছে, তাদের পক্ষে একাধিক বিয়ে না করাই কর্তব্য।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব ঃ সূরা আন্-নিসার এ আয়াতে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে না পারার আশংকার ক্ষেত্রে এক বিয়েতেই তৃপ্ত থাকার নির্দেশ এবং পরবর্তী আয়াতে 'তোমরা কোন অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না' এ দু' আয়াতের মূল তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পেরে অনেকেই এমন একটা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশংকার ক্ষেত্রে যেহেতু এক বিয়েরই নির্দেশ এবং খোদ কোরআনই যখন বলে যে, তোমরা কোন অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমান ব্যবহার বজায় রাখতে সমর্থ হবে না, সুতরাং পরোক্ষভাবে কোরআন এক বিয়েরই অনুমোদন দেয় এবং বহু বিবাহ রহিত করে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যে ভুল তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। কেননা, একাধিক বিয়ে বন্ধ করাই যদি আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রায় হত, তবে 'নারীদের মধ্যে যাদের ভাল লাগে তাদের মধ্য থেকে তোমরা দুই, তিন, চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পার'---এরূপ বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَّا تَعْدِلُوا বলে ইনসাফ কায়েম না করার সম্ভাবনা ব্যক্ত করারও কোন অর্থ হয় না।

এ ছাড়া খোদ রসূল (সা) সাহাবীদের কর্মধারা ও মৌখিক বর্ণনা এবং পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে মুসলিম সমাজে বিনা-দ্বিধায় একাধিক বিয়ের রীতি প্রচলিত থাকাই প্রমাণ করে যে, বহু বিবাহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন না।

প্রকৃত প্রস্তাবে সূরা আন্-নিসার এ আয়াত দ্বারা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপারে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। এবং দ্বিতীয় আয়াতে যা মানুষের সাধ্যের বাইরে অর্থাৎ আন্তরিক আকর্ষণের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। সুতরাং দুটি আয়াতের মর্মে যেমন কোন বৈপরীত্য নেই, তেমনি এ আয়াতের দ্বারা একাধিক বিবাহের অবৈধতাও প্রমাণিত হয় না।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَنْ لَّا تَعُوْلُوْا.....

এতে দুইটি শব্দ রয়েছে। একটি أَدْنٰى এটি دُنُوٌّ ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হয়

নিকটতর। দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে ঃ لا تعولوا = يعيل - عال ঝুঁকে পড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে শব্দটি অসঙ্গতভাবে ঝুঁকে পড়া এবং দাম্পত্য জীবনে নির্যাতনের পথ অবলম্বন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে তোমাদের যা বলা হলো—সমতা বজায় রাখতে না পারার আশঙ্কা থাকলে এক স্ত্রী নিয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহ কর কিংবা শরীয়ত-সম্মত ক্রীত-দাসী নিয়ে সংসার কর—এটা এমন এক পথ যা অবলম্বন করলে তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘনের আশংকাও দূর হবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, এক স্ত্রী হলে তো আর অবিচার কিংবা জুলুমের কোন অবকাশই থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'তোমরা জুলুম না করার নিকটে থাকবে' এরূপ বলার অর্থ কি ? বরং এখানে বলা উচিত ছিল যে, এক বিবাহের ক্ষেত্রে তোমরা অবিচারের পথ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যাবে।

জবাব হচ্ছে এই যে, যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে লোকেরা এক স্ত্রীকেও নানাভাবে জ্বালা-যন্ত্রণার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে রাখে সুতরাং এক স্ত্রীর সংসার করলে তোমরা জুলুম বা সীমালংঘন থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে যাবে এরূপ না বলে أَدْنَىٰ (আদ্না) শব্দটি বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, এটা অবিচারের পথ পরিহার করার নিকটবর্তী পন্থা। এ পথ অবলম্বন করলে তোমরা ইনসাফের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারবে। আর পরিপূর্ণ ইনসাফ তখনই হবে, যখন তোমরা স্ত্রীর বদ-মেজাজ, উদ্ধত আচরণ প্রভৃতি সবকিছু ধৈর্য সহকারে বরদাশত করতে পারবে।

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝٤

(৪) আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশি মনে। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে একাধিক স্ত্রীর বেলায় স্ত্রীদের প্রতি অনুষ্ঠিত সম্ভাব্য নির্যাতনের পথ বন্ধ করা হয়েছিল। এ আয়াতে নারীদের একটা বিশেষ হক বা অধিকারের কথা উল্লেখ করে এক্ষেত্রে যেসব জুলুম-নির্যাতন হতে পারত তা দূর করা হয়েছে। সে অধিকার হচ্ছে স্ত্রীর দেন-মোহর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর খুশিমনে দিয়ে দিও। তবে হ্যাঁ, যদি স্ত্রীরা খুশীর সাথে মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দেয় (অবশ্য পূর্ণ মোহরের বেলায়ও একই হুকুম), তবে (এমতাবস্থায়) তোমরা তা ভোগ কর অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

স্ত্রীদের মোহরের ব্যাপারে তখনকার দিনে অনেক ধরনের অবিচার ও জুলুমের পন্থা প্রচলিত ছিল।

এক—স্ত্রীর প্রাপ্য মোহর তার হাতে পৌঁছাতো না ; মেয়ের অভিভাবকরাই তা আদায় করে আত্মসাৎ করতো। যা ছিল একটা দারুণ নির্যাতনমূলক রেওয়াজ। এ প্রথা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে কোরআন নির্দেশ দিয়েছে ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ

এতে স্বামীর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, স্ত্রীর মোহর তাকেই পরিশোধ কর ; অন্যকে নয়। অন্যদিকে অভিভাবকদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মোহর আদায় হলে তা যার প্রাপ্য তার হাতেই অর্পণ কর। তাদের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে।

দুই—স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করার ক্ষেত্রে নানা রকম তিক্ততার সৃষ্টি হতো। প্রথমত, মোহর পরিশোধ করতে হলে মনে করা হতো যেন জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এ অনাচার রোধ করার লক্ষ্যেই আয়াতে نحلة শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত হাস্টমনে তা পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, অভিধানে نحلة বলা হয় সে দানকে, যা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রদান করা হয়।

মোট কথা, আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের মোহর অবশ্য পরিশোধ্য একটা ঋণ বিশেষ। এটা পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরী। পরন্তু অন্যান্য ওয়াজিব ঋণ যেমন সন্তুষ্ট চিত্তে পরিশোধ করা হয়, স্ত্রীর মোহরের ঋণও তেমনি হাস্টচিত্তে, উদার মনে পরিশোধ করা কর্তব্য।

তিন—অনেক স্বামীই তার বিবাহিতা স্ত্রীকে অসহায় মনে করে নানাভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মোহর মাফ করিয়ে নিতো। এভাবে মাফ করিয়ে নিলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হতো না। অথচ স্বামী মনে করতো যে, মৌখিকভাবে যখন স্বীকার করিয়ে নেওয়া গেছে, সুতরাং মোহরের ঋণ মাফ হয়ে গেছে। এ ধরনের জুলুম প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓئًا مَّرِيْٓئًا ۝

—অর্থাৎ যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মোহরের কোন অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবেই তোমরা তা হাস্টমনে ভোগ করতে পার।

অর্থ হচ্ছে, চাপ প্রয়োগ কিংবা কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি করে ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার অর্থ কোন অবস্থাতেই ক্ষমা নয়। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায়, খুশিমনে মোহরের অংশ বিশেষ মাফ করে দেয় কিংবা পুরোপুরিভাবে বুঝে নিয়ে কোন অংশ তোমাদের ফিরিয়ে দেয়, তবেই কেবল তা তোমাদের পক্ষে ভোগ করা জায়েয হবে।

এ ধরনের বহু নির্যাতনমূলক প্রথা জাহিলিয়াত যুগে প্রচলিত ছিল। কোরআন এসব জুলুমের উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজও মুসলিম সমাজে মোহর সম্পর্কিত এ ধরনের নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়। কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এরূপ নির্যাতনমূলক পথ পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য।

আয়াতে হাষ্টচিত্তে প্রদানের শর্ত আরোপ করার পেছনে গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কেননা, মোহর স্ত্রীর অধিকার এবং তার নিজস্ব সম্পদ। হাষ্টচিত্তে যদি সে তা কাউকে না দেয় বা দাবী ত্যাগ না করে, তবে স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষে সে সম্পদ কোন অবস্থাতেই হালাল হবে না। হুযূর (সা) নিম্নোক্ত হাদীসে শরীয়তের মূল-নীতিরূপে ইরশাদ করেছেন ঃ

الا لا تظلموا الا لا يحل مال امرء الا بطيب نفس منه ٥

---অর্থাৎ "সাবধান! জুলুম করো না। মনে রেখো, কারো পক্ষে পণ্যের সম্পদ তার আন্তরিক তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল হবে না।" ---(মিশকাত, পৃ. ২৫৫)

এ হাদীসটি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির নির্দেশ দেয়, যা সর্বপ্রকার প্রাপ্য ও লেনদেনের ব্যাপারে হালাল এবং হারামের সীমারেখা নির্দেশ করে।

আজকালকার যুগে স্ত্রীরা যেহেতু মনে করেন যে, স্বাভাবিকভাবে মোহর তো পাওয়া যাবেই না বরং দাবী করলে তিক্ততা এমনকি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফাটল সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয়, তাই তারা মোহরের দাবী মাফ করে দিয়ে থাকেন ; এ ধরনের ক্ষমার দ্বারা কিন্তু মোহরের ঋণ মাফ হয় না।

হযরত হাকীমুল-উম্মত মাওলানা থানভী (র) বলতেন, মোহরের অর্থ স্ত্রীর হাতে দেওয়ার পর স্ত্রী যদি তা ইচ্ছামত খরচ করার সুযোগ লাভ করা সত্ত্বেও স্বামীকে দিয়ে দেয়, কেবলমাত্র তবেই সেটাকে মাফ করার পর্যায়ে গণ্য করা যেতে পারে।

মা-বোনের ওয়ারিসী স্বত্বের ব্যাপারেও এ শর্তই প্রযোজ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতার মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছেলেরাই দখল করে বসে। বোনদের অংশ দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না। কেউ কেউ হয়ত দীনদারীর খেয়াল করে বোনদের কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেয়। বোন যেহেতু মনে করে যে, তার পাওনা অংশ আদায় করা সহজ নয়, তাই অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ভাইয়ের মন রক্ষার জন্য মৌখিকভাবে মাফ করে দেয়। পিতার মৃত্যুর পর মায়ের অংশ, বিশেষত বিমাতার প্রাপ্য অংশ নিয়েও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এসব অংশীদারের প্রাপ্য যে আন্তরিক তুষ্টির সাথে ক্ষমা করা হয় না, তা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং এটাও হাদীস শরীফের সাবধানবাণী অনুযায়ী সরাসরি জুলুম ছাড়া আর কিছু নয়। এ ব্যাপারে হযরত থানভী (র) আরো বলেন, হাদীস-শরীফে 'আন্তরিক তুষ্টির' শর্ত আরোপ করা হয়েছে, বিচার-বিবেচনার তুষ্টির কথা বলা হয়নি। কেননা, স্থূল বিচারে অনেক সময় বৃহত্তর কোন স্বার্থ উদ্ধারের ক্ষেত্রে মানুষ ঘুষ-রিশওয়াত দিয়েও তুষ্ট হয়। বড় কোন লাভের আশায় অনেকে হাষ্টচিত্তে সুদ দিয়ে টাকা সংগ্রহ করে। সুতরাং 'স্থূল বিচারে সন্তুষ্টি' শর্ত হলে

এ ঘুষ এবং সুদের অর্থও গ্রহণকারীর জন্য হালাল হতো কিন্তু যেহেতু ঘুষ বা সুদ দিয়ে কেউ 'আন্তরিক তুষ্টি' লাভ করতে পারে না, তাই এ অর্থ গ্রহীতার জন্য হালাল হয় না।'

মসজিদ-মাদরাসার চাঁদার ব্যাপারেও দাতার আন্তরিক তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। সমাজ পঞ্চায়েত বা নেতৃস্থানীয় কোন লোকের চাপের মুখে যদি কেউ আন্তরিক তুষ্টি ছাড়াই চাঁদা দান করে, তবে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা জায়েয হবে না; এ অর্থ দাতাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

আয়াতে صدقات শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটা صدقة শব্দের বহুবচন। صداق এবং صدقة স্ত্রীলোকের মোহরকে বলা হয়। মোল্লা আলী ক্বারী (র) মিশকাত শরীফের ভাষ্য 'মিরকাত'-এ লিখেছেন ঃ

وسمى به لانه يظهر به صدق ميل الرجل الى المرأة ٥

অর্থাৎ মোহরকে 'সাদুকা' বা 'সুদাক' এজন্য বলা হয় যেহেতু صدق ধাতুর মধ্যে নিষ্ঠা বা আকর্ষণ অর্থ পাওয়া যায়। মোহর যেহেতু স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আকর্ষণ বা নিষ্ঠার প্রমাণ করে, এদিকে লক্ষ্য রেখেই মোহরকে 'সাদুকা' বলা হয়।

هنيئا و مريئا—প্রায় সমার্থবোধক দু'টি শব্দ। অভিধানে ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই অর্জিত হয়। এমন খাদ্যবস্তুকে বোঝায়, যা অত্যন্ত সহজে গলাধঃকরণ করা চলে এবং কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই হজম ও শরীরের অংশে পরিণত হয়ে যায়।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝ وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَّبِدَارًا أَنْ يَّكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيبًا ۝

(৫) আর যে সম্পদকে আল্লাহ্ তোমাদের জীবনযাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিও না। বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও, পরাও এবং তাদেরকে সান্ত্বনার বাণী শোনাও। (৬) আর ইয়াতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত

না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করতে পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করতে পার। ইয়াতীমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করো না বা তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যারা সচ্ছল তারা অবশ্যই ইয়াতীমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ খেতে পারে। যখন তাদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যর্পণ কর, তখন সাক্ষী রাখবে। অবশ্য আল্লাহ্ই হিসাব নেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ইয়াতীমের মাল তাদের হাতে অর্পণ এবং স্ত্রীলোকের মোহর তাদেরকে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাতে এরূপ বুঝবার অবকাশ ছিল যে, ইয়াতীম এবং স্ত্রীলোকদের সম্পদ তাদের হাতেই তাৎক্ষণিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া কর্তব্য---সে সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার মত বয়স ও বুদ্ধি-বিবেচনা তাদের থাকুক বা নাই থাকুক! এরূপ ভুল বোঝার পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই পরবর্তী এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, নির্বোধের হাতে ধন-সম্পদ ছেড়ে দিও না, বরং তাদের প্রতি নজর রাখতে থাক, যে পর্যন্ত না সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং তা খরচ করার মত বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ তাদের মধ্যে হয়। যখন দেখবে, নিজের ধন-সম্পদ সামলে রাখার মত বুদ্ধি-বিবেচনা হয়েছে, তখন তাদের মাল তাদের হাতেই তুলে দাও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তার সহায়-সম্পত্তি তার হাতেই তুলে দিতে হবে। কিন্তু যদি সে অল্পবয়স্ক অর্বাচীন হয়, তবে) তোমরা (সেই) স্বল্পবুদ্ধির অর্বাচীনদের হাতে তোমাদের (অর্থাৎ তাদের) সেই সম্পদ তুলে দিও না, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সকলের জীবিকার অবলম্বন করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ সহায়-সম্পদ যত্নের সাথে সংরক্ষণ করার জিনিস। তাই এমন সময়ে তা ওদের হাতে দিও না, যখন তারা তা বিনষ্ট করে ফেলতে পারে)। আর এ সম্পদ থেকে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে থাক এবং সান্ত্বনা দিতে থাক (যে, তোমার ভালর জন্যই এগুলোর দায়িত্ব তোমার হাতে দেওয়া হচ্ছে না। বড় হয়ে বুদ্ধি-বিবেচনা হলে পর এগুলো তোমাকেই দেওয়া হবে এবং সহায়-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করার আগে কিছু কিছু করে তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা যাচাই করার প্রয়োজন হলে) তাদের পরীক্ষা করতে থাক (কিছু কিছু কেনা-বেচা এবং ছোট ছোট লেন-দেনের দায়িত্ব দাও। যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছে (অর্থাৎ বালেগ হয়ে যায়। কেননা, বিবাহের যোগ্যতা বালেগ হলে তার পরই হয়ে থাকে)। অতঃপর (বয়ঃপ্রাপ্তি ও পরীক্ষার পর) যদি তাদের মধ্যে যোগ্যতা দেখতে পাও (অর্থাৎ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার মত বুদ্ধি-বিবেচনা অনুভব কর) তখন তাদের মাল তাদের হাতে তুলে দাও। (আর যদি মনে কর যে, সম্পদ রক্ষা করার মত বুদ্ধি তার হয়নি, তবে এ অবস্থায়ও তার হাতে ধন-সম্পদ তুলে দিও না)। আর এ ইয়াতীমের মাল প্রয়োজনের অতিরিক্ত অথবা এ ধারণায় যে, সে বড় হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। হ্যাঁ, যদি এভাবে গ্রাস করার মতলব না থাকে,

তবে নির্দেশ হচ্ছে,) যে ব্যক্তির (এ সম্পদ) ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই (অর্থাৎ যার গ্রাসাচ্ছাদনের মত নিজের সম্পদ রয়েছে, যদি সে নিসাব-পরিমাণ মালের অধিকারী নাও হয়) সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে (সামান্য কিছু ব্যবহার করা থেকেও) মুক্ত রাখবে। আর যে ব্যক্তি দরিদ্র, সে সঙ্গত পরিমাণে অর্থাৎ যাতে জরুরী প্রয়োজন সম্পন্ন হয় সে পরিমাণ) খেতে পারে। অতঃপর যখন (অর্থাৎ বালেগ ও বুদ্ধি-বিবেচনা হওয়ার পর) তাদের সম্পদ তাদের কাছে দেওয়ার সময় সাক্ষী রাখবে। (কেননা, এরপর কোন কথা উঠলে যেন সাক্ষী কাজে আসে) এবং (এমনিতেই তো) আল্লাহ্ তা'আলাই হিসাবে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। (যদি আত্মসাৎ না হয়ে থাকে, তবে সাক্ষী না রাখলেও কোন ক্ষতি নেই। কেননা, প্রকৃত হিসাব যার সামনে দিতে হবে, তিনি তো তার হিসাব ভালভাবেই জানেন। আর যদি কিছু আত্মসাৎ করে থাকে তবে সাক্ষী রাখায় কোন ফায়দা নেই। কেননা, যাঁর কাছে হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে, তিনি তো খেয়ানত সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত আছেন। শুধুমাত্র বাহ্যিক শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে সাক্ষী কাজে আসবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সম্পদের হিফাযত জরুরী ঃ এ আয়াতে ধন-সম্পদের গুরুত্ব এবং মানুষের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে সম্পদের হিফাযতের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ ত্রুটির সংশোধন নির্দেশ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, অনেকেই স্নেহান্ধ হয়ে অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ ছেলেমেয়ে অথবা স্ত্রীলোকদের হাতে ধন-সম্পদের দায়-দায়িত্ব তুলে দেয়। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পদের অপচয় এবং দারিদ্র্য ঘনিয়ে আসার আকারে দেখা দেয়।

অর্বাচীন ও অনভিজ্ঞদের হাতে সম্পদ তুলে দেওয়া নিষিদ্ধ ঃ মুফাসসিরে কোরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, কোরআন-পাকের এ আয়াতে নির্দেশ করা হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান--সন্ততি কিংবা অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না, বরং আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু তোমাকে অভিভাবক এবং দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেজন্য তুমি সম্পদ তোমার নিজের হাতে রেখে তাদের খাওয়া-পরার দায়দায়িত্ব পালন করতে থাক। যদি তারা অর্থ-সম্পদের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেওয়ার আবদার করে, তবে তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দাও যে, এসব তোমাদের জন্যই সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যাতে তাদের মনোকষ্টের কারণ না হয়, আবার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকাও যেন দেখা না দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের এ ব্যাখ্যা মতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা এবং অনভিজ্ঞ যে কোন স্ত্রীলোকের হাতেই ধন-সম্পদ তুলে না দেওয়ার নির্দেশ প্রমাণ হয়—যাদের হাতে পড়ে সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। এতে ইয়াতীম শিশু বা নিজের সন্তানের কোন পার্থক্য নেই। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-ও এ আয়াতের এরূপ তফসীরই বর্ণনা করেছেন। ইমামে-তফসীর হাফেজ তাবারীও এ মতই গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যে এ আয়াতের নির্দেশ ইয়াতীমদের বেলাতেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কিন্তু আয়াতে যে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং 'তোমাদের সম্পদ' বলে যে ইশারা করা হয়েছে, তাতেও ইয়াতীম এবং সাধারণ বালক-বালিকা নির্বিশেষে সবার বেলাতেই এ নির্দেশ প্রযোজ্য বলে মনে হয়।

মোট কথা, মালের হিফাযত অত্যন্ত জরুরী এবং অপচয় করা গোনাহের কাজ। নিজের সম্পদের হিফাযত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। যেমন, জীবন রক্ষা করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সেও শহীদের মর্যাদা পাবে বলে হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে। হুযূর (সা) ইরশাদ করেন ঃ من قتل دون ماله فهو شهيد নিজের মালের হিফাযত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদ। অর্থাৎ সওয়াবের দিক দিয়ে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। ---(বুখারী ও মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

نعما بالمال الصالح للرجل الصالح ০ (مشكوة)

অর্থাৎ---একজন নেক লোকের সৎপথে অর্জিত সম্পদ কতই না উত্তম !

অন্য আর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل ০ (مشكوة)

যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, তার সম্পদশালী হওয়াতে দীনের দিক দিয়ে কোন অসুবিধা নেই।

শেষের দুটি হাদীসে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে, নেককার, মুত্তাকী লোকদের কাছে ধন-সম্পদ থাকলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, এ সব লোক তাদের ধন-সম্পদ গোনাহ্র পথে ব্যয় করবে না।

বহু ওলী, সূফী-জাহিদ যে নিজের অধিকারে ধন-সম্পদ রাখার অপকারিতা বর্ণনা করেছেন তার অর্থও এই যে, মানুষ সাধারণত পাপ পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে নিজের অর্জিত সম্পদ দ্বারাই আখিরাতের আযাব ক্রয় করে থাকে। তা ছাড়া প্রকৃতিগতভাবেই যেহেতু মানুষ সম্পদশালী হওয়ার পর অপচয় এবং সম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্নমুখী গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা ছেড়ে দেয়, এ জন্য সাধারণভাবে ধন-সম্পদ থেকে দূরে সরে থাকাই উত্তম মনে করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের সাধারণ নিয়ম ছিল যে, তাঁরা প্রয়োজন মত রোজগার করতেন এবং আল্লাহ্র যিকর করে সময় কাটিয়ে দিতেন। এ তরীকায় তাঁরা সম্পদের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব থেকে আত্মরক্ষা করতেন। কিন্তু আধুনিক কালে যেহেতু মানুষের মধ্যে দীন-ঈমানের গুরুত্ব অনেকাংশে কমে গেছে, পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি আকর্ষণ এত প্রবল হয়ে গেছে যে, দীনের জন্য কষ্ট সহ্য করা তো দূরের কথা, বাহ্যিক কোন ফ্যাশনের খেলাফ হলেও দীন ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায় ; সুতরাং এ ধরনের লোকদের জন্য হালাল সম্পদ রোজগার এবং তা যত্নের সাথে সংরক্ষণ করার গুরুত্ব প্রচুর। এ শ্রেণীর লোকদের প্রেক্ষিতেই হুযূর (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

كاد الفقر ان يكون كفرا - (مشكوة) অর্থাৎ দারিদ্র্য মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে কুফরীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দিতে পারে।

এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত সুফিয়ান সওরী (র) বলেন ঃ

كان المال فيما مضى يكره فاما اليوم فهو ترس المؤمن ০

অর্থাৎ অতীতকালে ধন-সম্পদ অপছন্দনীয় ছিল ; কিন্তু বর্তমান যুগে তা মু'মিনের জন্য ঢালস্বরূপ। তিনি আরো বলেন ঃ

من كان فى يده من هذه شيئا فليصلحه فانه زمان ان احتاج كان اول من يبذل دينه ০

"যার কাছে কিছু অর্থ-কড়ি রয়েছে, তার উচিত তা ঠিকমত কাজে লাগানো। কেননা, এটা এমন এক যমানা যখন কারো কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তা পূরণ করার জন্য সর্বপ্রথম দীনই খরচ করে বসবে।" অর্থাৎ প্রয়োজন মেটানোর তাকীদ দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চাইতে তীব্র হয়ে গেছে।—(মিশকাত, পৃ. ৪৯১)

নাবালেগদের যাচাই করা ঃ প্রথম আয়াত দ্বারা যখন বোঝা গেল যে, যে পর্যন্ত সাংসারিক ব্যাপারে নাবালেগদের বুদ্ধিমত্তা প্রমাণিত না হবে, সে পর্যন্ত তাদের হাতে ধন-সম্পদের দায়িত্ব অর্পণ করা সমীচীন নয়। সেজন্য দ্বিতীয় আয়াতে শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা ও যোগ্যতা যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। বলা হয়েছে ঃ

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ০

অর্থাৎ বালেগ হওয়ার আগেই ছোট ছোট দায়িত্ব দিয়ে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছে অর্থাৎ বালেগ হয়। মোট কথা, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক এবং যখন দেখ যে, তারা দায়িত্ব বহন করার যোগ্য হয়ে উঠেছে, তখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে বুঝিয়ে দাও। সারকথা হচ্ছে, শিশুদের বিশেষ প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের মাপকাঠিতে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (এক) বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময় ; (দুই) বালেগ হওয়ার পরবর্তী সময় ; (তিন) বালেগ হওয়ার আগেই জ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ।

ইয়াতীম শিশুর অভিভাবকগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁরা শিশুর লেখাপড়া ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছোট ছোট কাজ-কারবার এবং লেনদেনের দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের পরীক্ষা করতে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে.... وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى বাক্যের অর্থ এটাই। এ থেকে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কোন অপ্রাপ্ত

বয়স্ক শিশু যদি তার অভিভাবকের অনুমতিক্রমে লেনদেন বা ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে তা বৈধ ও কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে ঃ শিশু যখন বালেগ এবং বিয়ের যোগ্য হয়ে যায়, তখন তার অভিজ্ঞতা ও বিষয়-বুদ্ধির পরিমাপ করতে হবে। যদি দেখা যায়, সে তার ভালমন্দ বুঝবার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তখন তার বিষয়-সম্পত্তি তার হাতে তুলে দাও।

বালেগ হওয়ার বয়স ঃ আয়াতে শিশুর বালেগ হওয়ার সময়সীমা বলতে গিয়ে কোরআন-পাক বয়সের কোন সীমা উল্লেখ না করে বলেছে ঃ فَاِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ—অর্থাৎ তারা যখন বিয়ের বয়সে পৌঁছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বালেগ হওয়া বয়সের সীমার সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং বালেগ হওয়ার যেসব লক্ষণ রয়েছে, সেগুলোই এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য। সুতরাং শিশু যখন বিয়ে করার যোগ্যতা লাভ করবে, তখনই তাকে বালেগ বলে গণ্য করা হবে। এ যোগ্যতা কোন কোন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তের-চৌদ্দ বছর বয়সেও প্রকাশ পেতে পারে। তবে যদি কোন বালক-বালিকার ক্ষেত্রে বালেগ হওয়ার লক্ষণ আদৌ প্রকাশ না পায়, তবে সেক্ষেত্রে বয়স গণনা করেই তাকে বালেগ বলে ধরতে হবে। কোন কোন ফিকহ্‌বিদের মতে এ বয়স বালকদের ক্ষেত্রে আঠারো এবং বালিকাদের ক্ষেত্রে সতেরো। কারো কারো মতে বালক-বালিকা উভয়ের ক্ষেত্রে পনের বছর বয়স বালেগ হওয়ার সময়সীমা। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) এ অভিমতই গ্রহণ করেছেন! তাঁর মতে পনেরো বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর শরীরে বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও বালক এবং বালিকা উভয়কেই শরীয়তের দৃষ্টিতে বালেগ বলে গণ্য করতে হবে।

বুদ্ধি-বিবেচনার সংজ্ঞা ঃ আয়াতে উল্লিখিত اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا বাক্য দ্বারা কোরআনের এ নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, ইয়াতীম শিশুর মধ্যে যে পর্যন্ত বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ লক্ষ্য না কর, সে পর্যন্ত তাদের বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিও না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ 'বুদ্ধি-বিবেচনার' সময়সীমা কি? কোরআনের অন্য কোন আয়াতেও এর কোন শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এজন্য কোন কোন ফিকহ্‌বিদ মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি কোন ইয়াতীমের মধ্যে যথেষ্ট বয়স হওয়ার পরও বুদ্ধি-বিবেচনার লক্ষণাদি দেখা না যায়, তবে অভিভাবক তার হাতে বিষয়-সম্পত্তি তুলে দিতে পারবে না। সমগ্র জীবন এ সম্পত্তি তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখতে হলেও না।

এ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র)-র সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, এখানে বুদ্ধি-বিবেচনা না থাকার অর্থ হচ্ছে শিশুসুলভ চপলতা। বালেগ হওয়ার পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে এ চপলতা স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়ে যায়। সেমতে বালেগ হওয়ার বয়স পনের বছর এবং তারপর দশ বছর, এভাবে পঁচিশ বছর বয়স হওয়ার পর অভিভাবককে ধরে নিতে হবে যে, এতদিনে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ অবশ্যই ঘটেছে, সুতরাং তার বিষয়-সম্পত্তি তখন তার হাতেই তুলে দিতে হবে। কেননা, অনেকের মধ্যে জীবনের শেষ সীমা পর্যন্তও

বুদ্ধি-বিবেচনার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়নি। তাই বলে তাকে সারাজীবন তার বিষয়-সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। আর যদি সে লোক বদ্ধ পাগল কিংবা একেবারেই নির্বোধ হয়, তবে তার হুকুম স্বতন্ত্র। এ ধরনের লোকের ব্যাপারে নাবালেগ শিশুদের হুকুমই কার্যকর হবে। পাগলামির এ অবস্থায় সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়ে গেলেও অভিভাবককে সারা জীবনই তার সহায়-সম্পত্তির দেখাশোনা করতে হবে।

ইয়াতীমের মালের অপচয় ঃ উপরের আলোচনায় বোঝা গেল যে, ইয়াতীম শিশুর মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কিত যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ না ঘটা পর্যন্ত তাদের মাল তাদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে কিছু বেশী সময় অপেক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এমতাবস্থায় ক্ষেত্রবিশেষে ওলী বা অভিভাবকের তরফ থেকে এমন কোন পদক্ষেপও হওয়া বিচিত্র নয়, যাতে ইয়াতীমের সম্পদের ক্ষতি হতে পারে। সে জন্যই পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে ঃ

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا.....

অর্থাৎ ইয়াতীমের ধন-সম্পদ প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে খরচ করো না কিংবা তারা বড় হয়ে যাবে, মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না।

এ আয়াতে ইয়াতীমের অভিভাবককে দুটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। (এক) ইয়াতীমের মাল প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ না করতে এবং (দুই) অদূর ভবিষ্যতে যার মাল তাকে ফেরত দিতে হবে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তাড়াতাড়ি সে সম্পদ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে উড়িয়ে দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

ওলী কতটুকু গ্রহণ করতে পারে ঃ শেষ আয়াতে ইয়াতীমের বিষয়-সম্পত্তি হিফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি এ সম্পদ থেকে তার পারিশ্রমিক বাবদ কিছু গ্রহণ করতে পারে, এ সম্পর্কিত নির্দেশ বলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভাবী নয় কিংবা তার প্রয়োজনীয় খরচ-পত্রের ব্যবস্থা অন্যত্র থেকে সংস্থান করতে পারে, তার উচিত ইয়াতীমের মাল থেকে তার পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা। কেননা, ওলী হিসেবে ইয়াতীমের বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শোনা করার দায়িত্ব তার উপর ফরয কর্তব্য। সুতরাং এ দায়িত্ব পালন করার বিনিময়ে তার পক্ষে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ অর্থাৎ ওলীদের মধ্যে যে ব্যক্তি গরীব এবং যার রোজগারের অন্য কোন পথ নেই, সে নিতান্ত প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন পরিমাণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারে।

সাক্ষী রাখার নির্দেশ ঃ সর্বশেষে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○

অর্থাৎ পরীক্ষা করে দেখার পর ইয়াতীমের মাল যখন তাদের হাতে প্রত্যর্পণ কর, তখন কয়েকজন বিশ্বাসযোগ্য লোককে সাক্ষী করে রেখো, যাতে ভবিষ্যতে কোন ঝগড়া-ঝাটির সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ না থাকে। তবে স্মরণ রেখো, সবকিছুর হিসাবই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে রয়েছে।

ধর্মীয় ও জাতীয় খেদমতের পারিশ্রমিক ঃ আয়াতে উল্লিখিত নির্দেশের দ্বারা প্রাসঙ্গিক-ভাবে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা জানা গেল। তা হচ্ছে যাঁরা কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির দেখা-শোনায় নিযুক্ত হন, মসজিদ বা মাদ্রাসার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন কিংবা কোন ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী প্রতিষ্ঠানের যে কোন দায়িত্বে নিয়োজিত হন বা এমন কোন জাতীয় কাজে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন যে কর্তব্য সম্পাদন ফরযেকিফায়া—তাঁদের পক্ষেও যদি নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ করার মত সংস্থান থাকে, তবে এ ধরনের খেদমতের বদলায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা বায়তুল-মাল থেকে পারিশ্রমিক বাবদ কিছু গ্রহণ না করা উত্তম। অপরদিকে যদি পরিবারের ভরণ-পোষণ করার মত সহায়-সম্পদ না থাকে এবং রুজি-রোজগারের সময়টুকু উপরোক্ত দায়িত্ব পালনে ব্যয়িত হয়ে যায়, তাহলে এমতাবস্থায় পরিবারের ভরণ-পোষণের প্রয়োজন মেটানোর মত কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণে দোষ নেই। তবে 'প্রয়োজনীয় পরিমাণ' কথাটার প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে। অনেকে কাগজ-কলমে অবশ্য দীনী প্রতিষ্ঠানের খেদমতের বিনিময় নামেমাত্র কিছু পারি-শ্রমিক গ্রহণ করে থাকেন, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে নিজের এবং সন্তানাদির জন্য অনেক বেশী খরচ করে ফেলেন। এ ধরনের অসাবধানতার প্রতিকার একমাত্র আল্লাহ্র ভয় দ্বারাই হতে পারে। এদিকে ইশারা করেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

অর্থাৎ যারা এ ধরনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়, তাদেরকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এক-দিন হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে—এ অনুভূতিটুকু তাদের মধ্যে অবশ্যই জাগিয়ে রাখতে হবে। এ অনুভূতিই কেবলমাত্র অসাবধানতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۠ وَلِلنِّسَآءِ
نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۭ
نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ○ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَ

الْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝ وَلْيَخْشَ
الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۠ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ
وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا
اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۭ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝

(৭) পিতামাতার ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে ; অল্প হোক কিংবা বেশী। এ অংশ নির্ধারিত। (৮) সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু সদালাপ করো। (৯) তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল-অক্ষম সন্তান-সন্ততি ছেড়ে গেলে তাদের জন্য তারাও আশংকা করে ; সুতরাং তারা যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে। (১০) যারা ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।

যোগসূত্র ঃ সূরা আন্-নিসার প্রথমেই সাধারণ মানবিক অধিকার বিশেষত পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত অধিকারসমূহ বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে ইয়াতীমদের অধিকার বর্ণনা করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়েও নারী ও ইয়াতীমদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিশেষ অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে জাহিলিয়াত যুগের একটি কুপ্রথা বাতিল করা হয়েছে। তখন নারীদেরকে উত্তরাধিকারের যোগ্যই স্বীকার করা হতো না। এ আয়াতে তাদেরকে শরীয়তসম্মত অংশের অধিকারিণী সাব্যস্ত করে তাদের অংশ কম করতে এবং তাদের ক্ষতি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর যেহেতু উত্তরাধিকার সত্ত্বেও হকদারদের প্রসঙ্গ এসেছিল এবং এরূপ ক্ষেত্রে বন্টনের সময় হকদার নয়---এমন ফকির ও ইয়াতীম বালকবালিকাও উপস্থিত হয়ে যায়, তাই দ্বিতীয় আয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও খাতির-যত্ন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ আদেশ ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব।

এরপর তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতেও ইয়াতীমদের বিধি-বিধান প্রসঙ্গে এ বিষয়বস্তুর প্রতিই জোর দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পুরুষদের জন্যও (ছোট হোক কিংবা বড়) অংশ তা থেকে (নির্ধারিত) আছে, যা

(পুরুষদের) পিতামাতা ও (অথবা অন্যান্য) নিকটাত্মীয়রা (মৃত্যুর সময়) পরিত্যাগ করে যায় এবং (এমনিভাবে) নারীদের জন্যও তা থেকে ছোট হোক কিংবা বড়) অংশ (নির্ধারিত) আছে যা স্ত্রীলোকদের পিতা-মাতা ও (অথবা অন্যান্য) নিকট-আত্মীয়রা (মৃত্যুর সময়) পরিত্যাগ করে যায়, তা (পরিত্যক্ত সম্পত্তি) কম হোক অথবা বেশী (সবগুলো থেকেই পাবে)। অংশ (-ও এমন, যা) অকাট্যরূপে নির্ধারিত আছে। এবং (যখন ওয়ারিসদের মধ্যে ত্যাজ্য সম্পত্তি) বন্টনের সময় (এসব লোক) উপস্থিত থাকে (অর্থাৎ দূরবর্তী) আত্মীয়, (যাদের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে কোন অংশ নেই) ইয়াতীম ও দরিদ্র লোক (যারা এরূপ আশা করে যে, সম্ভবত আমরাও কিছু পেতে পারি। আত্মীয়রা সম্ভবত পাওনাদার হওয়ার ধারণা নিয়ে আসবে এবং অন্যরা দান-খয়রাত পাওয়ার আশায় আসবে) তবে তাদেরকেও এ (ত্যাজ্য সম্পত্তি) থেকে (যতটুকু সম্ভব,) কিছু দিয়ে দাও এবং তাদের সাথে ভদ্র (ও নম্র) কথা বল। (আত্মীয়দের সাথে নম্র কথা এই যে, তাদেরকে বুঝিয়ে দাও যে, শরীয়তের আইনে এতে তোমাদের অংশ নেই। কাজেই আমরা অপারক। এবং অন্যদের সাথে এই যে, কিছু দান-খয়রাত করে অনুগ্রহ প্রকাশ করো না) এবং (ইয়াতীমদের ব্যাপারে) তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পশ্চাতে ছোট ছোট সন্তান রেখে (মারা) গেলে তাদের (সন্তানদের) জন্য শঙ্কিত হয় (যে, এদেরকে বুঝি কেউ কোন কষ্ট দেয়! অতএব, অন্যের সন্তানদের প্রতিও এমনি লক্ষ্য রাখা উচিত এবং তাদেরকে কোন কষ্ট না দেওয়া উচিত)। অতএব, (একথা চিন্তা করে) তাদের উচিত, (ইয়াতীমদের সম্পর্কে) আল্লাহ্ তা'আলা (এর নির্দেশ অমান্য করা)-কে ভয় করা (অর্থাৎ কার্যত কষ্ট না দেওয়া ও ক্ষতি না করা) এবং (কথা-বার্তায়ও তাদের সাথে) যথোপযুক্ত কথা বলা। (এতে সান্ত্বনা ও মনোরঞ্জনের কথাবার্তাও এসে গেছে এবং শিক্ষা ও শিষ্টাচারের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। মোট কথা, তাদের জান ও মাল উভয়ের সংস্কার সাধন করা)। নিশ্চয়, যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ ন্যায্য অধিকার ছাড়া খায় (ভোগ করে,) তারা নিজেদের পেটে আর কিছু নয়---অগ্নি (এর স্ফুলিঙ্গ) ভর্তি করছে। (অর্থাৎ এ খাওয়ার পরিমাণ তাই হবে) এবং এ পরিমাণ বাস্তবায়িত হতে বেশী দেরী নেই। কারণ, অতিসত্বর (তারা দোযখের) জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে (যেখানে এই পরিমাণ দৃষ্টিগোচর হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার স্বত্ব ঃ ইসলাম-পূর্ব কালের আরব ও অনারব জাতিসমূহের মধ্যে দুর্বল শ্রেণী, ইয়াতীম বালক-বালিকা ও অবলা নারী চিরকালই জুলুম ও নির্যাতনের শিকার ছিল। প্রথমত তাদের কোন অধিকারই স্বীকার করা হতো না। কোন অধিকার স্বীকার করা হলেও পুরুষদের কাছ থেকে তা আদায় করে নেওয়ার সাধ্য কারও ছিল না।

ইসলাম সর্বপ্রথম তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে। এরপর এসব অধিকার সংরক্ষণেরও চমৎকার ব্যবস্থা করে। উত্তরাধিকার আইনেও জগতের সাধারণ জাতিসমূহ সমাজের উভয় প্রকার দুর্বল অঙ্গকে তাদের স্বাভাবিক ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে

রেখেছিল। আরবদের নিয়মই ছিল এই যে, যারা অশ্বারোহণ করে এবং শত্রুদের মোকাবিলা করে তাদের অর্থ-সম্পদ লুট করার যোগ্যতা রাখে, তারাই শুধুমাত্র উত্তরাধিকারের যোগ্য হতে পারে।---(রূহুল মা'আনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১০)

বলা বাহুল্য, বালক-বালিকা ও নারী উভয় প্রকার দুর্বল শ্রেণী এ নিয়মের আওতায় পড়ে না। তাই তাদের নিয়ম অনুযায়ী শুধু যুবক ও বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রই ওয়ারিস হতে পারতো। কন্যা কোন অবস্থাতেই ওয়ারিস বলে গণ্য হতো না, প্রাপ্ত বয়স্কা হোক অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা। পুত্র-সন্তানও অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে সে উত্তরাধিকারের যোগ্য বলে বিবেচিত হতো না।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে একটি ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। আউস ইব্নে সাবেত (রা) স্ত্রী, দুই কন্যা ও একটি নাবালেগ পুত্র রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রাচীন আরবীয় পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁর দুই চাচাতো ভাই এসে তাঁর সম্পত্তি দখল করে নিল এবং সন্তান ও স্ত্রীকে কিছুই দিল না। কেননা, তাদের মতে প্রাপ্ত বয়স্কা হোক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা, নারী সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারের যোগ্য গণ্য হতো না। ফলে স্ত্রী ও দুই কন্যা এমনিতেই বঞ্চিতা হয়ে গেল। প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়ার কারণে পুত্রকেও বাদ দেওয়া হলো এবং দুই চাচাতো ভাই সমগ্র বিষয়-সম্পত্তির ওয়ারিস হয়ে গেলো।

আউস ইবনে সাবেতের স্ত্রী এ প্রস্তাবও দিল যে, যে চাচাত ভাই তাদের বিষয়-সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে, তারা তার কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করে নিক, যাতে সে তাদের চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু তারা এ প্রস্তাবেও স্বীকৃত হলো না। তখন আউস ইবনে সাবেতের স্ত্রী রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এ অবস্থা বর্ণনা করলো এবং সন্তানদের অসহায়ত্ব ও বঞ্চনার অভিযোগ করলো। তখন পর্যন্ত উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কুরআন পাকের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তর দিতে বিলম্ব করলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ওহীর মাধ্যমে এই নিপীড়নমূলক আইনের অবশ্যই পরিবর্তন সাধন করা হবে। সেমতে তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

এরপর উত্তরাধিকারের অন্যান্য আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে অংশসমূহের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এ সূরার দ্বিতীয় রুকূতে এসব বিবরণ রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআনী বিধান অনুযায়ী মোট ত্যাজ্য সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ স্ত্রীকে দিয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে এভাবে বন্টন করলেন যে, অর্ধেক পুত্রকে এবং কন্যা-দ্বয়কে সমান হারে দিলেন। চাচাতো ভাই সন্তানদের তুলনায় নিকটবর্তী ছিল না। তাই তাদের বঞ্চিত করা হলো। ---(রূহুল-মা'আনী)

উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভের বিধি ঃ আলোচ্য আয়াত উত্তরাধিকারের কতিপয় বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে উত্তরাধিকারের আইন ব্যক্ত করে দিয়েছে।

مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ—এ শব্দদ্বয় উত্তরাধিকারের দুটি মৌলিক নীতি ব্যক্ত করেছে। এক—জন্মের সম্পর্ক, যা পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে রয়েছে এবং যা وَالِدَانِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই—সাধারণ আত্মীয়তা, যা اَقْرَبُونَ শব্দের মর্ম। বিশুদ্ধ মত অনুসারে اقربون শব্দটি সর্ব প্রকার আত্মীয়তায় পরিব্যাপ্ত; পারস্পরিক জন্মের সম্পর্ক হোক, যেমন পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে কিংবা অন্য প্রকার সম্পর্ক হোক, যেমন সাধারণ পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক হোক—সবগুলোই اقربون শব্দের আওতাভুক্ত। কিন্তু পিতামাতার গুরুত্ব অধিক। তাই তাদের কথা বিশেষভাবে পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর এ শব্দটি আরও ব্যক্ত করেছে যে, কোন আত্মীয়তার যে কোন সম্পর্কই ওয়ারিস হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং নিকটতম আত্মীয় হওয়া শর্ত। কেননা, নিকটতম হওয়াকে যদি মাপকাঠি করা না হয়, তবে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিই সমগ্র ভূপৃষ্ঠের মানুষের মধ্যে বন্টন করা জরুরী হয়ে পড়বে। কেননা, সব মানুষই এক পিতামাতা—আদম ও হাওয়ার সন্তান। মূল রক্তের দিক দিয়ে কিছু-না-কিছু সম্পর্ক সবার মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। এর বাস্তবায়ন প্রথমত সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়ত, যদি কোনরূপে চেষ্টা করে এর ব্যবস্থা করেও নেওয়া যায়, তবে ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করতে করতে অবিভাজ্য অংশ পর্যন্ত পৌঁছাবে, যা কারও কাজে আসবে না। তাই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যখন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, তখন এরূপ নীতি নির্ধারণ করে দেওয়া জরুরী ছিল, যার ফলে নিকট ও দূরের বিভিন্ন সম্পর্ক একত্রিত হলে নিকটের আত্মীয়কে দূরের আত্মীয়ের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আত্মীয় বিদ্যমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করতে হবে। অবশ্য যদি কিছু আত্মীয় এমন থেকে থাকে যে, একই সময়ে সবাই নিকটবর্তী সাব্যস্ত হয়, যদিও নিকটতম হওয়ার কারণ বিভিন্ন, তবে সবাই ওয়ারিস হবে। যেমন, সন্তানদের সাথে পিতামাতা কিংবা স্ত্রী থাকা—এরা সবাই নিকটতম ওয়ারিস, যদিও ঐ নৈকট্যের কারণ বিভিন্ন।

اقربون শব্দটি আরও একটি বিষয় ব্যক্ত করেছে যে, পুরুষদেরকে যেমন উত্তরাধিকারের হকদার মনে করা হয়, তেমনি নারী ও শিশুদেরকেও এ হক থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কেননা, সন্তানের সম্পর্ক হোক কিংবা পিতামাতার সম্পর্ক হোক অথবা অন্য কোন সম্পর্ক হোক, প্রত্যেকটিতেই সম্পৃক্ততার মর্যাদা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সমান। ছেলে যেমন পিতামাতা থেকে জন্মগ্রহণ করে, তেমনি মেয়েও পিতামাতারই সন্তান। উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্পর্কের উপর ভিত্তিশীল। কাজেই ছোট ছেলে কিংবা মেয়েকে বঞ্চিত করার কোন কারণই থাকতে পারে না।

এরপর কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গিও লক্ষণীয়। لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ-কে

এক্ষত্রে উল্লেখ করে সংক্ষেপে তাদের হক বর্ণনা করা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু কোরআন তা করেনি, বরং পুরুষদের হক যেরূপ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে, তেমনি বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সহকারে নারীদের হকও পৃথকভাবে উল্লেখ করেছে, যাতে উভয়ের হক যে স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ, তা ফুটে ওঠে।

اقربون শব্দ থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে, ত্যাজ্য সম্পত্তির বণ্টন প্রয়োজনের মাপকাঠিতে নয়, বরং আত্মীয়তার মাপকাঠিতে হবে। তাই আত্মীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত, তাকে বেশী হকদার মনে করা জরুরী নয়। বরং সম্পর্কে যে ব্যক্তি মৃতের অধিক নিকটবর্তী হবে, সে দূরবর্তীর তুলনায় অধিক হকদার হবে, যদিও প্রয়োজন ও অভাব দূরবর্তীর বেশী হয়। আর যদি নিকটতম আত্মীয়তার মাপকাঠির পরিবর্তে কোন কোন আত্মীয়ের অভাবগ্রস্ত ও উপকারী হওয়াকে মাপকাঠি করে নেওয়া হয়, তবে তা কোন বিধানই হতে পারে না কিংবা একটি সুনির্দিষ্ট অটল আইনের আকার ধারণ করতে পারে না। কেননা নিকটতম আত্মীয়তা ছাড়া অন্য যে কোন মাপকাঠি সাময়িক চিন্তাপ্রসূত হবে। কারণ, দারিদ্র্য ও অভাব চিরস্থায়ী নয়। অবস্থা ও স্তর সব সময় পরিবর্তিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় হকের দাবীদার অনেক বের হয়ে আসবে এবং ফয়সালাকারীদের পক্ষে এর ফয়সালা করা কঠিন হবে।

ইয়াতীম পৌত্রের উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্ন ঃ আজকাল ইয়াতীম পৌত্রের উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নটিকে অহেতুক একটি বিতর্কিত প্রশ্নে পরিণত করা হয়েছে। অথচ কোরআনে উল্লিখিত মূলনীতির ভিত্তিতে এ প্রশ্নটির অকাট্য সমাধান আপনা-আপনি বের হয়ে আসে। পুত্রের তুলনায় পৌত্র অধিক অভাবগ্রস্ত হলেও اقربون -এর আইনের দৃষ্টিতে সে ওয়ারিস হতে পারে না। কেননা, পুত্রের উপস্থিতিতে সে নিকটতম আত্মীয় নয়। তবে তার অভাব দূর করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এমনি এক ব্যবস্থা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে।

এ প্রশ্নে বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য ভক্ত নব শিক্ষিতদের ছাড়া কেউ দ্বিমত করেনি। সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় আজ পর্যন্ত কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এ কথাই বুঝে এসেছে যে, পুত্র বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পৌত্র উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না, তার পিতা বিদ্যমান থাকুক অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হোক।

মৃত ব্যক্তির মালিকানাধীন সব বস্তুতে ওয়ারিসদের হক আছে ঃ আয়াতে مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ বলে অপর একটি মূর্খতাসুলভ প্রথার সংস্কার করা হয়েছে। তা এই যে, কোন কোন সম্প্রদায়ে কোন কোন মালকে কিছু সংখ্যক বিশেষ ওয়ারিসদের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হতো। উদাহরণত ঘোড়া, তরবারি ইত্যাদি অস্ত্রে শুধু যুবক পুরুষদের হক ছিল। অন্য ওয়ারিসদেরকে এগুলো থেকে বঞ্চিত করা হতো। কোরআন পাকের এ নির্দেশ ব্যক্ত

করছে যে, মৃত ব্যক্তির মালিকানায় যা কিছু থাকে—ছোট হোক বড় হোক—সবকিছুতেই প্রত্যেক ওয়ারিসের হক আছে। কোন বিশেষ বস্তু বন্টন ছাড়াই নিজে রেখে দেওয়া কোন ওয়ারিসের জন্য বৈধ নয়।

উত্তরাধিকারের নির্ধারিত অংশ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মীমাংসিত ঃ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا এতে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বিভিন্ন ওয়ারিসের জন্য যে বিভিন্ন অংশ কোরআন নির্দিষ্ট করেছে, এগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত অংশ। এতে কারও নিজস্ব অভিমত ও অনুমানের ভিত্তিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার কোন অধিকার নেই।

উত্তরাধিকারিত্ব একটি বাধ্যতামূলক মালিকানা ঃ مَّفْرُوضًا শব্দ থেকে আরও একটি মাস'আলা জানা যায় যে, উত্তরাধিকারের মাধ্যমে ওয়ারিসরা যে মালিকানা লাভ করে, তা বাধ্যতামূলক। এতে ওয়ারিসের কবুল করা এবং সম্মত হওয়া জরুরী ও শর্ত নয়, বরং সে যদি মুখে স্পষ্টত বলে যে, সে তার অংশ নেবে না, তবুও আইনত সে নিজের অংশের মালিক হয়ে যায়। এটা ভিন্ন কথা যে, মালিক হওয়ার পর শরীয়তের বিধি অনুযায়ী অন্য কাউকে দান, বিক্রি অথবা বিলি-বন্টন করে দিতে পারবে।

বঞ্চিত আত্মীয়দের মনস্তুষ্টি বিধান করা জরুরী ঃ মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্যে এমন কিছু লোকও থাকবে, যারা শরীয়তের বিধি অনুযায়ী তার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অংশ পাবে না। বলা বাহুল্য, ফরায়েযের বিস্তারিত আইন-কানুন সম্পর্কে প্রত্যেকেই জ্ঞাত নয়। সাধারণভাবে প্রত্যেক আত্মীয়ই অংশ পাওয়ার আশা পোষণ করতে পারে। তাই যেসব আত্মীয় নিয়মানুযায়ী বঞ্চিত সাব্যস্ত হয়, বন্টনের সময় তারা বিষণ্ণ ও দুঃখিত হতে পারে, যদি তারা বন্টনের সময় মজলিসে উপস্থিত থাকে এবং বিশেষত যখন তাদের মধ্যে কিছু ইয়াতীম, মিসকীন ও অভাবগ্রস্তও থাকে। এমতাবস্থায় যখন অন্যান্য আত্মীয় নিজ নিজ অংশ নিয়ে যায় আর তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখে, তখন তাদের বেদনা, নৈরাশ্য ও মনো-কষ্ট ভুক্তভোগী মাত্রই অনুমান করতে পারে।

এখন কোরআনী ব্যবস্থার সৌন্দর্যও লক্ষ্য করুন। একদিকে স্বয়ং কোরআনেরই বর্ণিত সুবিচারভিত্তিক বিধান এই যে, নিকটবর্তী আত্মীয় বর্তমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয় বঞ্চিত হবে, অপরদিকে বঞ্চিত দূরবর্তী আত্মীয়ের মনোবেদনা ও নৈরাশ্যকেও উপেক্ষা করা হয়নি। এর জন্য একটি স্বতন্ত্র আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ـ

অর্থাৎ যেসব দূরবর্তী ইয়াতীম, মিসকিন ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যদি তারা বন্টনের সময় উপস্থিত থাকে, তবে অংশীদারদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এ মাল থেকে স্বেচ্ছায় তাদেরকে কিছু দিয়ে দেওয়া। এটা তাদের জন্য এক প্রকার সদকা ও সওয়াবের কাজ। যে সময় ওয়ারিসরা কোনরূপ চেষ্টা-চরিত্র ও কর্ম ব্যতিরেকেই শুধু আল্লাহ্র দীনের বিধানে ধন-সম্পদ পাচ্ছে, সে সময় আল্লাহ্র পথে সদকা-খয়রাতের প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মনে থাকা উচিত। এর একটি নযীর অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ—অর্থাৎ নিজেদের বাগানের ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং যেদিন ফল কর্তন কর, সেদিন এর হক বের করে ফকির-মিসকীনদেরকে দিয়ে দাও। এ আয়াত সূরা আন'আমে আসবে।

মোট কথা এই যে, ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টনের সময় আইনত অংশীদার নয়--এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন যদি সেখানে উপস্থিত হয়ে যায়, তবে তাদের উপস্থিত হওয়ার কারণে তোমরা মন ছোট করো না, বরং যে অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে বিনা পরিশ্রমে দান করেছেন, তা থেকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ কিছু দান কর এবং খরচ করার যে চমৎকার সুযোগ পেয়েছ, একে সৌভাগ্য মনে কর। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে কিছু-না-কিছু দান করার ফলে এসব দূরবর্তী আত্মীয়ের মনোবেদনা ও দুঃখ লাঘব হয়ে যাবে। মৃত ব্যক্তির বঞ্চিত পৌত্রও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তার চাচা ও ফুফুদের উচিত, নিজ নিজ অংশ থেকে সানন্দে তাদের কিছু দান করা।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا—যদি তারা এভাবে অল্প দেওয়াতে সন্তুষ্ট না হয় বরং অন্যান্যের সমান অংশ দাবী করতে থাকে, তবে তাদের এ দাবী আইন বিরুদ্ধ এবং অন্যায়ভিত্তিক হওয়ার কারণে তা মেনে নেওয়ার অবকাশ নেই। কিন্তু এরপরও তাদেরকে এমন কোন কথা বলা অনুচিত, যা মর্মপীড়ার কারণ হতে পারে, বরং যুক্তিসঙ্গতভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ত্যাজ্য সম্পত্তিতে তোমাদের কোন অংশ নেই। আমরা যা দিয়েছি তা নিছক সৎকাজ হিসাবে দিয়েছি। এখানে আরও একটি বিষয় জেনে নেওয়া জরুরী যে, তাদেরকে খয়রাত হিসাবে যা দেওয়া হবে, তা সমষ্টিগত মাল থেকে নয়, বরং প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিসদের মধ্যে যারা উপস্থিত থাকবে, তারা নিজেদের অংশ থেকে দেবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ থেকে দেওয়া জায়েয নয়।

বন্টনের সময় আল্লাহ্কে ভয় করবে ঃ তৃতীয় আয়াতে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি তার সন্তানরা যাতে পুরোপুরি পায় এবং এমন কোন পন্থা অনুসরণ করা না হয়, যার ফলে সন্তানদের অংশে অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সে বিষয়ে পুরোপুরি যত্নবান হতে হবে। এর ব্যাপকতার মধ্যে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত যে, আপনি কোন মুসলমানকে যদি এমন ওসিয়্যত কিংবা ক্ষমতা প্রদান করতে দেখেন, যার

ফলে তার সন্তান ও অন্যান্য ওয়ারিস ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে আপনার অবশ্য কর্তব্য হবে তাকে বাধা দান করা। যেমন, রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে সম্পূর্ণ মাল কিংবা অর্ধেক মাল সদকা করতে বাধা দান করেছিলেন এবং এক-তৃতীয়াংশ মাল সদকা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। ---(মিশকাত, পৃ. ২৬৫) কেননা, সম্পূর্ণ মাল কিংবা অর্ধেক মাল সদকা করা হলে ওয়ারিসদের অংশ বিলুপ্ত হতো অথবা হ্রাস পেতো।

এ বিষয়টিও আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত যে, ইয়াতীমদের অভিভাবকরা তাদের ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করার যোগ্য বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পুরোপুরি তাদেরকে অর্পণ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হবে। এতে কোনরূপ শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। অভি-ভাবকরা অপরের ইয়াতীম সন্তানদের অবস্থা নিজেদের সন্তান ও নিজেদের স্নেহ-মমতার সাথে তুলনা করে দেখবে। যদি তারা চায় যে, তাদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তানদের সাথে মানুষ সদ্ব্যবহার করুক, সন্তানরা উদ্বিগ্ন না হোক এবং কেউ তাদের প্রতি জুলুম না করুক, তবে তাদেরকেও অপরের ইয়াতীম সন্তানদের সাথে সর্বপ্রকারে সদ্ব্যবহার করা উচিত।

ইয়াতীমের মাল গ্রাস করার পরিণাম ঃ চতুর্থ আয়াতে ইয়াতীমদের সম্পত্তিতে অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগকারীদের জন্য ভীষণ শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি অবৈধভাবে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ গ্রাস করে, সে পেটে জাহান্নামের আগুন ভর্তি করে।

এ আয়াতে ইয়াতীমের মালকে জাহান্নামের আগুন বলা হয়েছে। অনেক তফসীরবিদ একে রূপক অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে খাওয়া এমন, যেমন কেউ পেটে আগুন ভর্তি করে। কেননা, তার পরিণাম কিয়ামতে এরূপই হবে। কিন্তু বিশেষ-জ্ঞগণের উক্তি এই যে, আয়াতে কোনরূপ অপ্রকৃত ও রূপক অর্থ নেই ; বরং ইয়াতীমের যে মাল অন্যায়ভাবে খাওয়া হয়, তা আগুন ছাড়া কিছুই নয়, যদিও উপস্থিত ক্ষেত্রে তার রূপ আগুনের মত মনে হয় না। যেমন, কোন ব্যক্তি দিয়াশলাইকে আগুন বলে অথবা সংখিয়া কালকূট-কে প্রাণ সংহারক বলে। বলা বাহুল্য, দিয়াশলাই হাতে নিলে হাত পুড়ে যায় না বা সংখিয়া স্পর্শ করলে এমন কি মুখে রাখলেও কেউ মরে যায় না। তবে সামান্য ঘষা খাওয়ার পর বোঝা যায়, যে ব্যক্তি দিয়াশলাইকে আগুন বলেছিল, সে ঠিকই বলেছিল। এমনিভাবে কন্ঠনালীর নিচে চলে যাওয়ার পর জানা যায় যে, কালকূট বা সংখিয়াকে প্রাণ সংহারক বলা ঠিকই ছিল। কোরআন পাকের সাধারণ প্রয়োগ-বিধিও এর সমর্থন করে। মানুষ সৎ-অসৎ যেসব কর্ম করছে, এগুলোই জান্নাতের বৃক্ষ, ফল-ফুল অথবা জাহান্নামের অঙ্গার ; যদিও এগুলোর আকার এখানে অন্যরূপ। কিন্তু কিয়ামতের দিন সব কিছুই স্বরূপে আত্ম-প্রকাশ করবে। কোরআন বলে ঃ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا — অর্থাৎ কিয়া-মতের দিন তারা যেসব আযাব ও সওয়াব প্রত্যক্ষ করবে প্রকৃতপক্ষে সেগুলো হবে তাদেরই কৃতকর্ম।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী কিয়ামতের

দিন এমতাবস্থায় উত্থিত হবে যে, তার পেটের ভেতর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা মুখ, নাক ও চক্ষু দিয়ে উপচে পড়তে থাকবে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন এক সম্প্রদায় এমতাবস্থায় উত্থিত হবে যে, তাদের মুখ আগুনে জ্বলতে থাকবে। সাহাবায়ে-কিরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! এরা কারা? তিনি বললেন ঃ তোমরা কি কোরআনে পাঠ করনি الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا (ইবনে-কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬)

আয়াতের সারমর্ম এই যে, অন্যায়ভাবে ভক্ষিত ইয়াতীমের মাল প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের আগুন হবে যদিও উপস্থিত ক্ষেত্রে আগুন হওয়া অনুভূত নয়। এ জন্যই রসূলুল্লাহ্ (সা) এ ব্যাপারে অত্যধিক সতর্কতার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে ঃ

احرج مال الضعيفين المرأة واليتيم—আমি তোমাদেরকে বিশেষভাবে দু'ধরনের অসহায়ের মাল থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে হুঁশিয়ার করছি ; একজন নারী ও অপরজন ইয়াতীম।---(ইবনে-কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬)

সূরা নিসার প্রথম রুকূর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইয়াতীমদেরই বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করা, তাদের মালকে নিজের মাল করে না নেওয়া এবং ওয়ারিসী সূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ থেকে তাদেরকে অংশ দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে। তারা বড় হয়ে যাবে—এ আশংকায় তাদের ধন-সম্পদ দ্রুত উড়িয়ে দেওয়া, ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করে মোহরানা কম দেওয়া অথবা তাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করে নেওয়া ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অবশেষে বলা হয়েছে ঃ অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল খাওয়া পেটে আগুনের অঙ্গার ভর্তি করার নামান্তর। কেননা, এর দায়ে মৃত্যুর পর এ ধরনের লোকদের পেটে আগুন ভরে দেওয়া হবে। يَأْكُلُونَ শব্দ ব্যবহার করে ইয়াতীমের মাল খাওয়ার শাস্তিবাণী শুনানো হয়েছে। কিন্তু ইয়াতীমের মালের সর্বপ্রকার ব্যবহার পানাহারের মাধ্যমে হোক কিংবা অন্যভাবে ভোগ করার মাধ্যমে হোক—সবই হারাম এবং আল্লাহ্র গজব ও শাস্তির কারণ। কেননা, বাকপদ্ধতিতে কারও অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলার অর্থ সর্বপ্রকার ব্যবহারকেই বোঝায়।

কোন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার সম্পদের প্রত্যেক অংশ ও প্রত্যেক ছোট-বড় বস্তুর সাথে প্রত্যেক ওয়ারিসের হক সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানরা যদি ইয়াতীম হয়, তবে এসব সন্তানের সাথে সাধারণত প্রতি পরিবারেই জুলুম ও অন্যায় ব্যবহার করা হয়। এসব সন্তানের পিতার মৃত্যুর পর যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ স্বীয় অধিকারভুক্ত করে

নেয়, তাদের চাচা হোক কিংবা বড় ভাই হোক কিংবা মাতা হোক কিংবা অন্য কোন অভিভাবক অথবা অছি হোক, সে প্রায়ই আলোচ্য রুকূতে নিষিদ্ধ অপরাধসমূহ করে থাকে। প্রথমত বছরের পর বছর চলে যায় ; মাল বন্টনই করে না। ইয়াতীমদের অন্ন, বস্ত্র বাবদ কিছু কিছু ব্যয় করতে থাকে মাত্র। এরপর বিদ'আত, কুপ্রথা ও বাজে খাতে এই যৌথ মাল থেকে ব্যয় করতে থাকে। নিজের জন্যও খরচ করে এবং সরকারী রেকর্ড-পত্রে নাম পরিবর্তন করে নিজ সন্তানদের নামও লিখিয়ে নেয়। এ ধরনের অপকর্ম থেকে কোন একটি পরিবারও মুক্ত আছে কি না সন্দেহ।

মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানাসমূহে ইয়াতীমদের জন্য যে চাঁদা আদায় হয়, তা ইয়াতীমদের জন্য ব্যয় না করাও ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করার অন্যতম পন্থা।

মাস'আলা ঃ মৃত ব্যক্তির পরিধানের পোশাকও ত্যাজ্য সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হিসাবে শামিল না করে এমনিতেই সদকা করে দেওয়া হয়। কোন কোন এলাকায় তামা-পিতলের বাসন-পত্রও মালামাল বন্টন করা ব্যতিরেকেই ফকির-মিস্কীনকে দান করে দেয়। অথচ এগুলোতে নাবালেগ ও অনুপস্থিত ওয়ারিসদেরও হক থাকে। প্রথমে মালামাল বন্টন করে মৃতের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, পিতামাতা ও ভাই-বোনদের মধ্যে আইনত যার যার অংশ আছে, তাদেরকে দিয়ে দেবে। এরপর নিজের খুশীতে যে যা চাইবে, মৃতের পক্ষ থেকে খয়রাত করবে কিংবা সম্মিলিতভাবে করলে শুধু বালেগরা করবে। নাবালেগের অনুমতিও ধর্তব্য নয়। যে ওয়ারিস অনুপস্থিত, তার অংশ থেকে তার অনুমতি ব্যতীত ব্যয় করা বৈধ নয়।

মৃতকে কবরস্তানে নিয়ে যাওয়ার সময় লাশের উপর যে চাদর রাখা হয়, তা কাফনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা মৃতের মাল থেকে ক্রয় করা বৈধ নয়। কেননা, তা হল যৌথ মাল। কেউ নিজের পক্ষ থেকে ক্রয় করে দিলে জায়েয হবে। কোন কোন এলাকায় জানাযার নামাযের ইমামের জন্য কাফনের কাপড় দিয়েই জায়নামায তৈরী করা হয়। এরপর তা ইমামকে দান করা হয়। এ খরচও কাফনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কাজেই ওয়ারিসদের যৌথ মাল দ্বারা তা ক্রয় করা বৈধ নয়।

কোন কোন স্থানে মৃতকে গোসল দেওয়ার জন্য নতুন পাত্র ক্রয় করা হয়। অতঃপর তা ভেঙে ফেলা হয়। প্রথমত নতুন পাত্র ক্রয় করা অনাবশ্যক। কারণ, ঘরে যে পাত্র আছে, তা দ্বারাই গোসল দেওয়া যায়। অগত্যা ক্রয় করার প্রয়োজন হলে ভেঙে ফেলা জায়েয নয়। কেননা, এতে সম্পদের অপচয় হয়। এ ছাড়া এর সাথে ইয়াতীম ও অনুপস্থিত ওয়ারিসদের হক জড়িত থাকতে পারে।

ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে তা থেকে মেহমানদের আদর-আপ্যায়ন, দান-খয়রাত ইত্যাদি করা বৈধ নয়। এ ধরনের দান-খয়রাত দ্বারা মৃত ব্যক্তি কোন সওয়াব পায় না, বরং সওয়াব মনে করে দেওয়া আরও কঠোর গোনাহ্। কারণ, কারও মৃত্যুর পর সমস্ত মাল ওয়ারিসদের অধিকারভুক্ত হয়ে যায়। ওয়ারিসদের মধ্যে ইয়াতীমও থাকতে পারে। এরূপ যৌথ মাল থেকে দেওয়া কারও মাল চুরি করে মৃতের জন্য সদকা করার অনুরূপ।

কাজেই প্রথমে মাল বন্টন করতে হবে। এরপর ওয়ারিস যদি নিজের মাল থেকে স্বেচ্ছায় মৃতের জন্য খয়রাত করে, তবে তা করতে পারে।

বন্টনের পূর্বেও ওয়ারিসদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যৌথ ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে দান-খয়রাত করবে না। কারণ, তাদের মধ্যে যারা ইয়াতীম, তাদের অনুমতি ধর্তব্যই নয়। যারা বালেগ, তারাও সানন্দে অনুমতি দিয়েছে কি না তা নিশ্চিত নয়। হতে পারে তারা চক্ষুলজ্জার খাতিরে অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছে বা লোকনিন্দার ভয়ে অনুমতি দিয়েছে। লোকে বলবে, নিজেদের মুর্দার জন্য দু'পয়সাও ব্যয় করলে না; এ লজ্জার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনিচ্ছায় হ্যাঁ বলে দিয়েছে; অথচ শরীয়তে শুধু ঐ মালই হালাল, যা মনের খুশীতে দেওয়া হয়। এর পূর্ণ বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে জনৈক বুযুর্গের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। এতে মাস'আলাটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বুযুর্গ ব্যক্তি জনৈক অসুস্থ মুসলমানকে দেখতে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ রোগীর কাছে বসতেই রোগীর আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে উড়ে গেল। তখন গৃহে একটিমাত্র বাতি জ্বলছিল। বুযুর্গ ব্যক্তি কালবিলম্ব না করে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। অতঃপর নিজের কাছ থেকে পয়সা দিয়ে তেল আনিয়ে বাতি জ্বালালেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেনঃ যতক্ষণ লোকটি জীবিত ছিল, ততক্ষণ সে বাতির মালিক ছিল এবং তার আলো ব্যবহার করা জায়েয ছিল। এখন সে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। ফলে তার প্রত্যেকটি বস্তু ওয়ারিসদের মালিকানায় চলে গেছে। অতএব, সব ওয়ারিসের অনুমতিক্রমে আমরা বাতিটি ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু তারা সবাই এখানে উপস্থিত নয়। কাজেই নিজের পয়সা দিয়ে তেল আনিয়ে আমি আলোর ব্যবস্থা করেছি।

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ
لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

(১১) আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেনঃ একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু'এর অধিক,